ওতম্

রামায়ণ দর্পণ

(রামায়ণের বিশেষ শিক্ষা)

স্বামী ব্রহ্মমুনি পরিব্রাজক
গুরুকুল কাংগড়ী বিশ্ববিদ্যালয় (হরিদ্বার)

॥ ওতম্ ॥

রামায়ণ দর্পণ

(রামায়ণের বিশেষ শিক্ষা)

লেখক

স্বামী ব্রহ্মমুনি পরিব্রাজক, বিদ্যামার্তণ্ড
গুরুকুল কাংগড়ী বিশ্ববিদ্যালয় (হরিদ্বার)

অনুবাদক

শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল
বিদ্যা রত্ন, সাহিত্যালংকার

সম্পাদনা

শ্রী রজিৎ চন্দ্র

বেদ-গীতা শাস্ত্র অন্বেষণ

[সর্বদা সত্য ও ধর্মের পথে]

রামায়ণ দর্পণ

অর্থাৎ

রামায়ণের বিশেষ শিক্ষা

রামায়ণ আর্যজাতির প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ। এর মধ্যে মনুষ্য জীবন থেকে মুক্তি পাবার, সমাজ সংস্কারের, রাষ্ট্র-উত্থানের, কলা-কৌশল নির্মাণের শিক্ষা সম্বন্ধে অধিকতর বর্ণনা লক্ষিত হয়। এই গ্রন্থের মূখ্য শিক্ষাপ্রদ পাত্র যদিও মর্যাদা পুরুষোত্তম রাম তথাপি ভরত ও অন্যান্য চরিত্রও অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। সূতরাং রামায়ণের নিকৃষ্ট পাত্রও কোনো না কোনো অংশে আমাদেরকে শিক্ষা দান করে। রামায়ণের বিশেষ চরিত্রগুলি — ভরত, লক্ষণ, সীতা, দশরথ, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, কৌশল্যা, রাবণ, রাম ইত্যাদি ক্রমশঃ তাঁদের বর্ণনা এখানে করা হবে। তৎপশ্চাৎ রামায়ণকালীন সামাজিক, নাগরিক, রাষ্ট্রীয় ও কলা-কৌশলাদির বর্ণণাও করা হবে।

পুস্তকের ত্রুটি — পুস্তকে রাবণের বিষয়ে লেখা হয়েছে যে, তিনি মাতা সীতার সাথে বলপূর্বক সমাগম করার চেষ্টা করেন নি, একারণে রাবণকে এখানে একটু ঠিক বলা হয়েছে।

সত্য – রামায়ণের অনুসারে রাবণকে ব্রহ্মা শাপ দিয়েছিল যে, যদি তুমি অন্য কারোর সহিত বলপূর্বক সমাগম করো তো তোমার মস্তক চূর্ণ হয়ে যাবে।

✰ উত্তরকাণ্ড সম্পূর্ণ রূপে প্রক্ষিপ্ত, এবং এটিই সত্য। কিন্তু লেখক সেখান থেকেও কিছু কথা এই পুস্তকে লিখেছেন, তাই পাঠকগণ সেদিকে খেয়াল রাখবেন।

সম্পাদকীয়

নমস্কার, সকল অমৃতজাত পরমাত্মার সন্তানদের ! রামায়ণ এবং মহাভারত যেমন আমাদের ঐতিহাসিক গ্রন্থ তেমনি আমাদের জীবনের অনুকরণীয় অনুসরণীয় গ্রন্থও বটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বর্তমানে রামায়ণ এবং মহাভারত উভয়ই বিবিধ প্রকারে প্রক্ষিপ্ত অংশে পরিপূর্ণ হয়ে অসত্যকেই যেন সত্য করে তুলে ধরছে আমাদের সামনে। একারণে অনেকেই নানারকম বিভ্রান্তিতে ভোগ করে। সেই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিতেই স্বামী ব্রহ্মমুনি পরিব্রাজক বাল্মীকি রামায়ণের উপর "**রামায়ণ দর্পণ**" গ্রন্থটি রচনা করেছেন আর্য ভাষায় (হিন্দি ভাষায়), এবং তার বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রী সতীশ চন্দ্র মণ্ডল। আমরা এই উভয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তৎসহিত গ্রন্থের প্রুভ রিডিং করেছেন শ্রী ধনঞ্জয় অধিকারী অঙ্গি দাদা, তাঁর প্রতিও অশেষ কৃতজ্ঞতা।

এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কালে গ্রন্থে উল্লেখিত রেফারেন্স এবং শ্লোকের বিবিধ ত্রুটি রয়ে যায়। একারণেই প্রচলিত সংস্করণে সেই ত্রুটিগুলো নিয়ে পাঠকদের মাঝে অনেক সমালোচনা হয়ে থাকে। সেই কারণে এই সংস্করণে সেই সমালোচনা এড়াতে আমরা চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটি রেফারেন্স খুঁজে খুঁজে নির্ভূলভাবে যুক্ত করার, যাতে বাল্মিকী রামায়ণের সাথে এর রেফারেন্স সহজেই পাঠকগণের নিকট উপলব্ধ হয়।

[বি.দ্রঃ এই সংস্করণে প্রযুক্ত রেফারেন্স সংগ্রহ করা হয়েছে গীতাপ্রেসের হিন্দি বাল্মিকী রামায়ণ থেকে। যার প্রথম সংস্করণ, ২০১৭ সালে প্রকাশিত।]

আমি আশাবাদী যে, এই সংস্করণটি পাঠকদের নিকট সমাদৃত হইবে॥

— রজিৎ চন্দ্র

রামায়ণ দর্পণ সূচী

ভরত

লক্ষ্মণ

দর্পণ-সূচী

সীতা

দশরথ

কৈকেয়ী

দর্পণ-সূচী

কৌশল্যা

সুমিত্রা

রাবণ

রাম

দর্পণ-সূচী

রামায়ণে কিছু ধার্মিক বর্ণনা

সামাজিক

নাগরিক শিষ্টাচার ও রীতিনীতি

পারিভাষিক শব্দ ও প্রবাদ বাক্য

দর্পণ-সূচী

রামায়ণ কালীন কয়েকটি বিশেষ বস্তু

রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় বর্ণনা

দেশ

কলাকৌশল ও বিজ্ঞানবিদ্যা

১. গৃহ, শালা (বাড়ি) ও সেতু

২. নগর, উদ্যান

৩. আয়ুধ (অস্ত্র-শস্ত্র)

৪. হস্তশিল্প

৫. যন্ত্র ও যন্ত্রযান

৬. বিমান (বায়ুযান)

৭. বিজ্ঞান

৮. অন্যান্য বিদ্যা

হনুমান ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা

রামায়ণ দর্পণ

পূর্বাদ্ধ

ভরত

রামায়ণে ভরতের স্থান উচ্চে। ভরতের মর্যাদাবোধ, ধার্মিক মনোভাব, রামের প্রতি ভক্তি এবং জ্যৈষ্ঠানুবৃত্তির তুলনা হয়না। যে ভরতকে রাজ্য প্রদান করার জন্য কৈকেয়ী রামকে বনবাসে পাঠালেন, রামের বনবাস হেতু শোকে দশরথের মৃত্যু হওয়া সত্ত্বেও মৃত্যুসংবাদ গুপ্ত রেখে দশরথের হয়ে ভরতকে মাতুলালয় থেকে ডেকে পাঠানো হলো, পুনরায় ভরতের অযোধ্যায় উপস্থিত হলে মন্ত্রীগণ তাঁকে রামের বনবাস ও পিতার দেহাবসানের বৃত্তান্ত শুনিয়ে তাঁকে রাজ সিংহাসনে বসার অনুমতি দিলেন কিন্তু সেই ভরত রাজ্যপ্রাপ্তিতে প্রসন্ন না হয়ে নিম্নভাবে বিলাপ করে অচেতন হয়ে ভূমিতে পতিত হন –

অভিষেক্ষ্যতি রামং তু রাজা যজ্ঞং নু যক্ষ্যতে।
ইত্যহং কৃতসঙ্কল্পো হৃষ্টো যাত্রামযা সিষম্॥
(বা০ রা০ অযো০ ৭২/২৭)

আমার পিতা রাজা দশরথ রামের রাজাভিষেক হেতু রাজসূয় যজ্ঞ করবেন এই সংকল্প মনে ধারণ করে প্রসন্নচিত্তে আমি যাত্রা করেছিলাম। হায় ! এ কী হলো ?

ভরতের সৌজন্যবোধের এই প্রথম দৃশ্য। রাজ্য লাভের জন্য আজকাল লোকেরা ভাইকে হত্যা পর্যন্ত করে কিন্তু এখানে ভরত নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে বিলাপ করেন, অচেতন হয়ে যান এবং পুনরায় চৈতন্যলাভ করে নিজের মাতাকে ধিক্কার দিতে থাকেন –

দুঃখে মে দুখমকরোর্বনে ক্ষারমিবাদদাঃ।
রাজানং প্রেতভাবস্থং কৃত্বা রামং চ তাপসম্॥
কুলস্যাস্য ত্বমভাবায় কালরাত্রিরিবাগতাঃ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৭৩/৩,৪)

হে মাতা, তুমি দুঃখের মধ্যে দুঃখ দিয়েছো, ঘায়ে লবণ দিয়েছো, পিতাকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়েছ এবং রামকে বনবাসী করেছ ! এই কুলের নানা হেতু তুমি কালরাত্রি হয়েছো।

এখন ভরত কেবল এই মনে করে সন্তুষ্ট থাকেন না যে, যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে, রাম বনে চলে গেছেন, রাজ্যভার তো সামলাতেই হবে কিন্তু ভরত রামের খোঁজে গৃহ হতে নিষ্পান্ত হন। মার্গের এক স্থলে গঙ্গার তীরে যেখানে বৃক্ষের নীচে ঘাসের উপর রাম রাত্রিয়াপন করেছিলেন সেখানে তিনি এই বলে বিলাপ করেন –

হা হতোস্মি নৃশংসো‌ऽযস্মি যৎ সভার্যঃ কৃতে মম।
ঈদৃশীং রাঘবঃ শয্যামধিশেতে হ্যনাথবৎ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৮৮/১৭)

হা ! আমি হতঃ আমি নৃশংস। আমার কারণে পত্নীসহ রাম অনাথের মতো এই ধরিত্রীরূপী শয্যায় শয়ন করেন।

ভরতের কার্য কেবল বিলাপেই শেষ হয়না বরং তিনি রামকে খুঁজে বের করে তাঁকে অযোধ্যায় ফিরে আসার জন্য বিস্তর অনুরোধ করেন। অত্যন্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাম যখন অযোধ্যায় ফিরতে সম্মত হলেন না তখন ভরত বাধ্য হয়ে কি রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ করেন ? আদৌ নয়। তিনি রামের পাদুকা প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করে স্বয়ং বানপ্রস্থী হয়ে নন্দীগ্রাম নামক আশ্রমে রামের প্রত্যাবর্তনের জন্য চতুর্দশ বর্ষ কালযাপন করেন –

স পাদুকে সংপ্রনম্য রামং বচনমব্রবীৎ।
চতুর্দশ হি বর্ষানি জটাচীরধারো হ্যহম্॥

ফলমূলাশনো বীর ভবেয়ং রঘুনন্দন।
ত্বাগমনমাকাংক্ষন্ বসন্ বৈ নগরাদ বহিঃ॥
তব প্রাদুকয়োন্যস্য রাজ্যতন্ত্রং পরন্তপ।
চতুর্দশে হি সম্পর্ণে বর্ষেৎহনি রঘূত্তম॥
ন দ্রক্ষ্যামি যদি ত্বাং তু প্রবেক্ষ্যামি হুতাশ নম্॥
(বা০ রা০ অযো০ ১১২/২৩-২৫)

ভরত রামের চরণ পাদুকা গ্রহণ করে বললেন – হে রাম ! চতুর্দশ বৎসর পর্যন্ত জটাবল্বন ধারী বানপ্রস্থ ধারণ করে ফলমূল আহার করে আপনার আগমনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে নগরের বাহিরে বাস করতে থাকব এবং চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ার দিন আপনার দর্শন না পেলে আমি অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবো।

রামের আগমনের প্রতীক্ষায় ভরতের কী অবস্থা হয়েছিল তা হনুমানের মুখ থেকেও শ্রবণ করুন যখন লঙ্কা বিজয় করে শ্রীরাম অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন কালে হনুমানকে ভরতের অবস্থা জ্ঞাত হওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন –

আসসাদ দ্রুমান্ ফুল্লান্ নন্দিগ্রামসমীপগান্।
ক্রোশমাত্রে ত্বয়োধ্যায়াশ্চীরকৃষ্ণাজিনাশ্বরম্॥
দদর্শ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রমবাসিনম্।
জটিলং মলদিগ্ধাঙ্গং ভ্রাতৃব্যসন কর্শিতম্॥
ফলমূলাশিনং দান্তং তাপসং ধর্মচারিনম্।
সমুন্নতজটাভারং বল্কলাজিন বাসিনম্।
নিয়তং বাবিতাত্মানং ব্রহ্মর্ষিসমতেজসম্॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১২৫/২৮, ৩০,৩১,৩২)

অর্থাৎ অযোধ্যানগর থেকে ক্রোশমাত্র দূরত্বে বল্কল ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করে দুঃখিত, কৃশ, জটিল ধূলিধূসরিত, শৃঙ্গারহীন ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল ফলমূলাহারী দয়নীয়, তপস্বী, ধর্মচারী, উন্মুক্ত কেশসম্পন্ন, বৃক্ষছাল ও অজিনোপরি আসীন নিয়তেন্দ্রিয় চিন্তাশীল ব্রহ্মর্ষি সদৃশ

ভরতকে রামের আদেশে হনুমান দর্শন করলেন।

এখানে ভরতের আদর্শ কতখানি উচ্চ লক্ষ্য করার বিষয়। রাম রাজ্য ত্যাগ করে বনবাসে গিয়েছেন অর্থাৎ পিতৃ আজ্ঞা পালন হেতু অথচ ভরত রাজ্যশ্রী পরিত্যাগ করলেন এবং বানপ্রস্থী হলেন স্বেচ্ছায়। রামের প্রতি জেষ্ঠানুবৃত্তিধর্ম এবং মর্যাদা পালন হেতু ভরতের ত্যাগ রামের ত্যাগ অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নয় বরং এই দিক দিয়ে উন্নত বলতে হবে।

শুধু তাই নয়, ভরতের চিন্তাধারা আরও উন্নত যখন তিনি স্বীয় মাতা কৈকেয়ীকে সম্মুখস্থ করে বলছেন –

আনায্য চ সহাবাহুং কৌশলেন্দ্রং মহাবলম্।
স্বয়মেব প্রবেক্ষ্যামি বনং মুনিনিষেবিতম্॥
নহ্যহং পাপসঙ্কল্পে পাপে পাপং ত্বয়া কৃতম্।
শক্তো ধারয়িতুং পৌরৈর শ্রু কণ্ঠে নিরীক্ষিতঃ॥
সা ত্বমগ্নিং প্রবিশ বা স্বয়ং বা বিশ দন্ডকান্।
রজ্জুং বধান বা কণ্ঠে নহি ত্যেন্যৎ পরায়নম্॥
(বা০ রা০ অযো০ ৭৪/৩১-৩৩)

হে পাপিনী ! আমি সেই মহাবলবান রামকে নিয়ে এসে স্বয়ং বনে গমন করবো, তুমি বিরাট পাপ করেছ। আমি অশ্রুসিক্ত প্রজাদের দৃষ্টিগোচর রামের কল্পনা করতে পারি না। তুমি হয় অগ্নিতে প্রবেশ করো বা দণ্ডকারণ্যে চলে যাও কিংবা গলায় রজ্জু বন্ধন করে ঝুলে পড়ো।

ভরতের মধ্যে রামের প্রতি ভক্তি প্রেমের পরিচয়ের দ্বারাও পাওয়া যায় যখন লঙ্কা বিজয়ের পরে হনুমান রামের আগমনের কুশল সংবাদ ভরতকে দিতে আসেন –

এবমুক্তো হনুমতা ভরতঃ কৈকেয়ীসূতঃ।
পপাত সহসা হৃষ্টো হর্ষোলোহমুপাগমৎ॥
ততো সুহুর্তাদুত্থায় প্রত্যাশ্বাস্য চ রাঘবঃ।
হনুমন্তমুবাচেদং ভরতঃ প্রিয়বাদিনম্॥

অশোকজৈঃ প্রীতিময়ৈঃ কপিমালিঙ্গ্য সংভ্রমাৎ।
মিষেচ ভরতঃ শ্রীমান বিপুলৈরস্রবিন্দুভিঃ ॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১২৫/৪০-৪২)

এইরূপ রামের আগমনকুশলবার্তা শ্রবণ করে ভরত আনন্দ ও উল্লাসে মোহিত হয়ে ভূমিতে পতিত হন। পুনরায় নিজেকে সামলে নিয়ে প্রিয়বাদী হনুমানকে আলিঙ্গন বদ্ধ করে আদরপূর্বক অনেক কথা বললেন এবং হর্ষযুক্ত প্রীতিপূর্ণ বহু অশ্রু দ্বারা তাঁকে সিঞ্চন করলেন।

এ পর্যন্ত ভরতের নিজস্ব জীবনবৃত্তান্ত থেকে জ্ঞাত হওয়া গেলো যে, তিনি উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। এখন এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য রূপে রাম ও দশরথের বচনও শ্রবণ করুন –

ন সর্বে ভ্রাতরস্তাত ভবন্তি ভরতোপমাঃ।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১৮/১৫)

রাম সুগ্রীবকে বললেন যে, ভরতের ন্যায় ভ্রাতা সকলে হয়না এবং কৈকেয়ীকে শান্ত করতেও বুঝিয়ে দশরথ বলেন –

ন কথঞ্চিৎ ঋতে রামাদ ভরতো রাজ্যভাবসেৎ ॥
রামাদপি হি তং মন্যে ধর্মতো বলবত্তরম্।
(বা০ রা০ অযো০ ১২/৬১-৬২)

হে কৈকেয়ী ! তুমি যে ভরতের জন্য রাজ্যের নিমিত্ত রামকে বনবাসে পাঠাচ্ছ সে রাম ব্যতীত কোনভাবে সিংহাসনে বসবে না কেননা সে রাম অপেক্ষা বেশি ধার্মিক এই রকম আমি মনে করি।

ভরতের দুই পুত্র ছিলো — তক্ষ ও পুষ্কল। তক্ষ তক্ষশিলা (পাঞ্জাবে রাওলপিন্ডীর নিকটে ট্যাক্সিলা নামে বিখ্যাত) এবং পুষ্কল গন্ধর্ব দেশে (গান্ধার-কান্ধার) পুষ্কলাবত নগর স্থাপন

করে –

তক্ষং তক্ষশিলায়াং পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্বদেশে রুচিরে গন্ধার নিলয়ে চ সঃ॥
(বা০ রা০ উত্তর০ ১০১/১১)

মনোহর গন্ধর্বদেশে তক্ষশিলা নামের নগরী স্থাপন করে সেখানে তক্ষকে রাজা করেন এবং গান্ধার দেশে পুষ্কলাবত নগর স্থাপন করে সেই রাজ্যের দায়িত্ব পুষ্কলকে প্রদান করেন।

লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণও রামায়নের একটি আদর্শ চরিত্র। লক্ষ্মণের তপস্যা ও ধর্মভাবনা রাম অপেক্ষা কম নয়। রাম বনবাসে গেলেন পিতার আজ্ঞায় কিন্তু লক্ষ্মণ রামসহ বনে গমন করেন স্বেচ্ছায়, জেষ্ঠানুবৃত্তি, ভক্তি ও ধর্মভাবনার কারণে। লক্ষ্মণের বনবাস রামের বনবাস অপেক্ষা বেশি কঠিন, বেশি আদর্শময়, রাম বনে বিনোদ-প্রমোদের সাধনভূত স্বীয় ধর্মপত্নীকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। লক্ষণকে অনেকে ব্রহ্মচারী বলে মনে করেন কিন্তু তিনি বিবাহিত ছিলেন। সীতার কনিষ্ঠাভগ্নী ঊর্মিলা সহিত তাঁর বিবাহ হয়েছিল। রামায়ণে বলেছে –

দদামি পরমপ্রীতো বধ্বৌ তে মুনিপুঙ্গব।
সীতাং রামায় ভদ্রং তে ঊর্মিলাং লক্ষ্মণায় বৈ॥
(বা০ রা০ বাল্য ৭২/২০)

বিশ্বামিত্র মুনিকে রাজা জনক বললেন যে, আমি অত্যন্ত প্রীত হয়ে রামের জন্য সীতাকে ও লক্ষ্মণের জন্য ঊর্মিলাকে প্রদান করছি। এবং...

মম চৈবানুজা সাধ্বী ঊর্মিলা শুভদর্শনা।
ভার্যার্থে লক্ষ্মণস্যাপি দত্তা পিত্রা মম স্বয়ম্॥
(বা০ রা০ অযো০ ১১৮/৫৩)

সীতা বললেন যে, আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী ঊর্মিলাকে আমার পিতা স্বয়ং লক্ষ্মণের পত্নীরূপে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন।

লক্ষ্মণকে ব্রহ্মচারী বলা যেতে পারে পত্নী সঙ্গে না থাকার কারণে, যেহেতু বনবাসে তাঁকে পত্নীরহিত হয়ে থাকতে হয়েছিল। সংযম পালন হেতু রামকেও ব্রহ্মচারী বলা যেতে পারে। দেখুন রাম নিজেকে ও লক্ষ্মণকে সংযম পালন হেতু ব্রহ্মচারীও বলেছেন –

পুত্রৌ দশরথস্যাবাং ভ্রাতবৌ রামলক্ষ্মনৌ।
প্রবিষ্টৌ সীতয়া সার্ধং দুশ্চরং দন্ডকাবনম্॥
ফলমূলাশনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিনৌ।
(বা০ রা০ অরণ্য০ ২০/৭,৮)

রাম বলেছেন যে, দশরথের পুত্র আমরা দুই ভ্রাতা রাম-লক্ষণ ফলমূল সেবনকারী জিতেন্দ্রিয় তপস্বী ব্রহ্মচারী সীতা সহিত গভীর দণ্ডকারণ্যে এসেছি।

রামের জন্য দেহত্যাগের আদর্শ —

লক্ষ্মণের আদর্শ হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, তিনি রামের পরিবর্তে স্বয়ং মৃত্যুবরণ করতে ইচ্ছুক রামকে লক্ষ্মণ বললেন –

মাং হি ভূত বলিং দত্বা পালয়স্ব যথাসুখম॥
অধিগন্তাসি বৈদেহীসচিরেণেতি মে মতিঃ।
প্রতিলভ্য চ কাকুৎস্থ পিতৃপৈতামহীং মহীম্॥
তত্র মাং রাম বাজ্যস্থ, স্মর্তুমর্হসি সর্বদা।
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৬৯/৩৯,৪০,৪১)

হে রাম ! এই কবন্ধ রাক্ষসের জন্য আমাকে বলি দিয়ে তুমি সীতাকে শীঘ্র প্রাপ্ত করবে। তারপর পিতৃ পিতামহের রাষ্ট্রভূমি প্রাপ্ত হয়ে রাজ্যে স্থিতি লাভ করে আমাকে স্মরণ করবে।

আশ্চর্য! এতো বড়ো সর্মন্তুদ আদর্শ — লক্ষ্মণ ভ্রাতা হেতু আত্মবলি দিতে উদ্যত। আজকালে এইরূপ প্রাণ দিতে চায়না। সদাচারের প্রতিমূর্তি –

নাহং জানামি কেয়রে নাহং জানামি কুন্ডলে॥
নূপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ।
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৬/২২,২৩)

সীতার অন্বেষণে পথে কিছু অলঙ্কার দেখে যখন লক্ষ্মণকে রাম জিজ্ঞাসা করলেন হে লক্ষ্মণ! তুমি কি এই অলঙ্কারগুলি চিনতে পারছো ? এগুলি কি সীতার ? লক্ষ্মণ উত্তরে বললেন আমি সীতার বাহুভূষণ চিনি না, তাঁর কর্মকুণ্ডলও জানি না, আমি কেবল তাঁর নূপুরকে চিনি কেননা প্রতিদিন আমি তাঁর পদাভিবন্দন (চরণে প্রণাম) করে থাকি।

লক্ষ্মণের দৃষ্টি ইচ্ছাকৃতভাবে সীতার পদোপরি পতিত হতো অন্য কোনো অঙ্গোপরি নয়। সুতরাং অন্যান্য অঙ্গে কী অলঙ্কার আছে তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এতো উচ্চ সদাচারের দৃষ্টান্ত দুর্লভ।

লক্ষ্মণের সদাচারের প্রভাব সীতার উপরেও পড়েছিল। সীতা হনুমানকে বললেন –

পিতৃবদ বর্ততে রামে মাতৃবন্মা সমাচরৎ।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৩৮/৫৮)

হে হনুমান ! লক্ষ্মণ রামকে পিতৃতুল্য এবং আমাকে মাতৃতুল্য জ্ঞান করে তদ্রুপ আচরণ করে।

নারীর প্রতি লক্ষ্মণের অবাঙ্মুখতা অন্যত্রও দেখতে পাওয়া যায় –

স তাং সমীক্ষ্যৈব হরীশপত্নীং তস্থাবুদাসীনতয়া মহাত্মা।
অবাঙমুখো্যভুন্মনুজেন্দ্রপুত্রঃ শ্রীসন্নিকর্ষাদ্বিনিবৃত্ত কোপঃ ॥
(বা০ রা০ কি০ ৩৩/৩৯)

তারা নামক বালি-পত্নীকে দেখে লক্ষ্মণ উদাসীন ভাব অর্থাৎ উপেক্ষাপূর্বক অবাঙ্গমুখ দাঁড়িয়ে রইলেন।

বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি লক্ষ্মণ

নিজ পত্নী ত্যাগ করে রামসহ লক্ষ্মণের বনে প্রস্থান করা তাঁর পূর্ণ বৈরাগ্য ও সংযমশীলতা প্রকাশ করে। অবসর মতো তিনি রামকেও বৈরাগ্যের উপদেশ প্রদান করেন –

স্মৃত্যা বিয়োগজং দুঃখং ত্যজ স্নেহং প্রিয়ে জনে।
অতিস্নেহপরিষ্কঙ্গাদ বর্তিরাদ্রাপি দহ্যতে॥
(বা০ রা০ কি০ ১/১১৬)

হে রাম ! সীতাকে স্মরণ করে তার বিয়োগের দুঃখ হয়। এইজন্য তার প্রতি সমত্ব ত্যাগ করো কেননা এর ফলে অন্তর্দাহ ছাড়া আর কী হবে ? (বিয়োগের ফলে দুঃখ হয় এইরূপ পরিনাম চিন্তা করে প্রিয়জনের প্রতি মমত্ব পরিত্যাগ করুক)। অতিস্নেহের (ঘৃত-তৈলাদি স্নেহ জাতীয় পদার্থ) সঙ্গের ফলে আর্দ্র বর্তিকাও দগ্ধ হয়। এবং.....

স চিন্তয়া দুঃসহয়া পরীতং বিসংজ্ঞমেকং বিজনে তপস্বী।
ভ্রাতুর্বিশাদাত্ত্বরিতো্যতিদীনঃ সমীক্ষ্য সৌমিত্রিরুবাচরামম্॥
কিমার্য কামস্য বশঙ্গতেন কিমাত্মপৌরুষস্য পরাভবেন।
অয়ং সদা সংহ্রিয়তে সমাধিঃ কিমত্র যোগেন নির্বর্তিতেন॥
ক্রিয়াভিযোগং মনসঃ প্রসাদং সমাধিযোগানুগতং চ কালম্।
সহায়সামর্থ্য মদীনসত্বঃ স্বকর্মহেতুং চ কুরুস্ব তাত॥
(বা০ রা০ কি০ ৩০/২৫-২৭)

নির্জন স্থানে অসহ্য চিন্তা-পরিবৃত ব্যাকুল রামকে দর্শন করে মনস্বী লক্ষ্মণ ভ্রাতার দুঃখে বিগলিত হয়ে তৎক্ষনাৎ রামকে বললেন হে আর্য ! আপনার এই পুরুষকারনাশক কামবশিত্ব থেকে কী লাভ ? তার দ্বারা আপনার স্থির সমাধি, মানসিক একাগ্রতা, সুস্থতা নষ্ট হয়ে যাবে। আপনার এই সাধিত যোগ দিয়ে কী লাভ ? মনকে প্রসন্ন ও সুস্থকারক সমাধির অনুকূল উচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ সহায়সামর্থ্যকে কর্মের জন্য বীর হয়ে সেবন করুন।

এইরূপ কয়েকটি দিক দিয়ে লক্ষ্মণের জীবনও রাম থেকে কম আদর্শের ছিলো না বরং বেশিই বলতে হবে। রামের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে রামের শীর্ষকে দর্শানো হবে।

লক্ষ্মণের দুই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু এবং তাদের স্থান –

অঙ্গদীয়া পুরী রম্যাপ্যঙ্গদস্য নিবেশিতা।

চন্দ্রকেতোশ্চ মল্লস্য মল্লভূম্যাং নিবেশিতা ॥
চন্দ্রকান্তেতি বিখ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যতা ॥
(বা০ রা০ উত্তর০ ১০২/৮,৯)

কারুপথ দেশে অঙ্গদীয়া নামক পুরী অঙ্গদের এবং চন্দ্রকেতুর মল্লদেশে চন্দ্রকান্তা পুরী ছিলো। চন্দ্রকান্তা পুরী স্বর্গপুরী নামে বিখ্যাত। অঙ্গদকে পশ্চিম দিকে এবং সমান চন্দ্রকেতুর উত্তর দিকে প্রেরণ করা হলো।

সীতা

সীতা সমগ্র পৃথিবীর নারীজাতির আদর্শ পতির সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ জ্ঞান করা, পতির আবাস-প্রবাসে সহযোগ দেওয়া প্রত্যেক স্ত্রীর ধর্ম। সুতরাং রামের বনযাত্রার সময় সীতা রামকে বলেন –

পতি সহযোগ –

যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃজন্তী কুশকিন্ত কান্॥
(বা০ রা০ অযোধ্যা০ ২৭/৭)

হে রাম ! যদি তুমি আজই দুর্গম বনে প্রস্থান করো তাহলে আমি তোমার অগ্রে পথের কুশক এবং কাটাঁকে পদদলিত করে আমি চলব।

সীতা রামের সঙ্গে পরামর্শ না করে নিঃসঙ্কোচে বনবাসে রামের সহিত যাওয়ার আবেগময় প্রস্তাব রাখেন। রাম তাঁকে বনের অনেক প্রকার কষ্টের ভয় দেখিয়ে সীতাকে বনে না যাওয়ার জন্য বললেন কিন্তু সীতা মানলেন না। তিনি বললেন –

যে তুয়া কীর্তিতা দোষাবনে বস্তব্যতাং প্রতি।
গুণানিত্যেব তান্ বিদ্ধি তব স্নেহপুরস্কৃতান্॥
(বা০ রা০ অযো০ ২৯/২)

হে রাম! তুমি বনে যাওয়ার যে সব কষ্টরূপ দোষ দর্শিয়েছ, সেগুলি তোমার স্নেহের সম্মুখে আমার পুরুস্কাররূপ বটে এবং.....

কুশক্রাশশরেষীকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুক্ষাঃ।
তূলাজিন সমস্পর্শা মার্গে মম সহ তুয়া॥
(বা০ রা০ অযো০ ৩০/১২)

হে রাম ! কুশ, কাশ, শর, শলাকা ও অন্যান্য কণ্টকযুক্ত ঝোপঝাড়গুলি তোমার গমনপথে আমার নিকট তুলা ও অজিন সমস্পর্শদায়ক হবে। অতএব, আমি তোমার সঙ্গে অবশ্যই বনে গমন করবো।

সীতার পতিব্রততা —

সীতা – **তৃণমন্তরতঃ কৃত্বা প্রত্যুবাচ শুচিস্মিতা।**

(বা০ রা০ সুন্দর০ ২১/৩)

যখন রাবণ সীতার নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তখন সেই পতিব্রতা দেবী চমকে উঠলেন এবং নিজের ও রাবনের মধ্যে একটি তৃণ রেখে উত্তরে বললেন –

শক্যা লোভয়িতুং নাহৈমৈশ্বর্যেন ধনেন বা।
অনন্যা রাঘবেনাহং ভাস্করেণ প্রভা যথা॥
উপধায় ভুজং তস্য লোকনাথস্য সৎকৃতম্।
কথ নামোপধাম্যাসি ভুজমন্যস্য কস্যচিৎ॥
অহমৌপায়িকী ভার্যা তস্যৈব বসুধাপতেঃ।
ব্রতস্নাতস্য ধীরস্য বিদ্যেব বিদিতাত্মনঃ॥

(বা০ রা০ সুন্দর০ ২১/১৫-১৭)

হে রাবণ ! তুমি আমাকে ঐশ্বর্য বা ধন দ্বারা প্রলোভিত করতে পারো না। আমি সূর্যপ্রভাসদৃশ হয়ে অন্য কারো সাহায্য কীকরে গ্রহণ করতে পারি ? সত্য বলতে গেলে আমি তার একান্তভাবে বশীভূত যেমন ধীর আত্মজ্ঞানী স্নাতকের বিদ্যা একান্তভাবে তার বশীভূত হয়। এবং.....

ত্বং পুনর্জম্বুকঃ সিংহীং মামিহেচ্ছসি দুর্লভাম্।
নাহং শক্যা ত্বয়া স্পষ্টুমাদিত্যস্য প্রভা যথা॥

(বা০ রা০ অরণ্য০ ৪৭/৩৭)

সীতা বললেন – হে রাবণ ! তুমি জম্বুক (শিয়াল)। আমাকে তুমি সূর্যের জ্যোতিসদৃশ স্পর্শ করতে পারো না।

তসাহং ধর্মনিত্যস্য ধর্মপত্নী দৃব্রতা।
ত্বয়া স্পষ্টং ন শক্যাহং রক্ষসা ধর্মপাপিনা॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৫৬/১৯)

আমি সর্বদা ধর্মপরায়ণ রামের দৃঢ়ব্রতসম্পন্ন ধর্মপত্নী, তুমি রাক্ষস, অধম, আমাকে তুমি স্পর্শ করতে পারো না।

ভর্তুর্ভক্তিং পুরস্কৃত্য রামাদন্যস্য বানর।
নাহং স্প্রষ্টুং স্বতো গাত্রমিচ্ছেয়ং বানরোত্তম॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৩৬/৬২)

হে হনুমান! তুমি নিঃসন্দেহে বলবান কিন্তু তোমার সঙ্গে তোমার অঙ্গের সাহায্য নিয়ে আমি যেতে পারি না কেননা ভর্তার ভক্তি স্মরণে রেখে রাম ভিন্ন অন্য কারো গাত্র স্বেচ্ছায় আমি স্পর্শ করতে চাই না।

সীতা সন্ধ্যা করতেন

সীতা কেবল পতিব্রতাই নয় কিন্তু তিনি সন্ধ্যোপাসনাও করতেন —

সন্ধ্যাকালমনাঃ শ্যামা ধ্রুবমেষ্যতি জানকী।
নদীং চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্ণিনী॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ১৪/৪৯)

এখন প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা উপাসনার সময়, এই সময়ে উত্তম সুন্দরী জনককুমারী সীতা উপাসনার জন্য অবশ্যই এই পূণ্যসলিলা নদীর তীরে আসবে।

এখানে ***শ্যামার*** তাৎপর্য উত্তম, কৃষ্ণ বর্ণ নয়। কেননা সীতাকে সূবর্ণযুক্ত বলা হয়েছে –

"ইয়ং কনকবর্ণাঙ্গী রামস্য মহিষী প্রিয়া"
(বা০ রা০ সুন্দর০ ১৫/৪৮)

হনুমান সীতা সম্বন্ধে চিন্তা করে মনস্থ করে যে, সন্ধ্যাশীল সীতা সন্ধ্যা করার জন্য অবশ্যই এই জলাশয়ের নিকটে আগমন করবে। সীতা ধর্মতত্ত্ব জ্ঞাতাও ছিলেন। সুতরাং প্রয়োজন মতো রামকেও তিনি পরামর্শ দান করতেন –

অপরাধং বিনা হন্তুং লোকান্ বীর ন মংস্যতে ॥
ক্ষত্রিয়ানাং তু বীরানাং বনেষু নিয়তাত্মনাম্।
ধনুষা কার্যমেতাবদার্তা নামভিরক্ষণম্ ॥
কচ শস্ত্রং ক্ব চ বনং ক্ব চ ক্ষাত্রং তপঃ ক্বচ।
আত্মানং নিয়মৈস্তৈস্তৈঃ কর্ষয়িতা প্রয়মতঃ।
প্রাপ্যতে নিপুনৈধর্মো ন সুখাল্লভতে সুখম্ ॥
নিত্যং শুচিমতিঃ সৌম্য চর ধর্মং তপোবনে।
(বা০ রা০ অরণ্য ৯/২৫, ২৬, ২৭, ৩১, ৩২)

হে রাম ! বিনা অপরাধে কারো হত্যা করা বাঞ্ছনীয় নয়। বনে নিবাসকারী জিতেন্দ্রিয় বীর ক্ষত্রিয়ের ধনুকের প্রয়োজন কেবল আর্তদের রক্ষা করা। কোথায় রাজ্য আর কোথায় এই বনবাস ? কোথায় শস্ত্র এবং কোথায় এই তপস্যা। হে রাম ! সেই সব নিয়মগুলি দ্বারা নিজ আত্মাকে প্রচেষ্টা সহ সংযত করে নিপুণ জন ধর্ম প্রাপ্ত করে থাকে। নিয়মরহিত হয়ে সহজে ধর্মপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। অতএব, এই তপোবনে নিত্য পবিত্র মতিসম্পন্ন হয়ে ধর্মাচরণ করো।

সীতা এখানে তপস্বীর ধর্ম কত সুন্দরভাবে রামকে বললেন। সুতরাং সীতা রাম অপেক্ষা ধর্মতত্ত্ব কম জানতেন না। তিনি ধর্মনিষ্ঠ ও ধর্মবিদ ছিলেন। ভারতের নারীদের সীতার নিকট এই শিক্ষাও গ্রহণ করা উচিত যে, ধর্মের জ্ঞান রেখেও তাঁদেরকে স্বয়ং ধর্মপরায়ণ হতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে পতিদেবকে অধর্ম থেকে রক্ষা করে ধর্মের দিকে প্রেরিত করুক।

দশরথ

দশরথ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয় যে, তিনি মর্যাদা লঙ্ঘন করে তিনটি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, কৌটিল্যাদি রাজ ধর্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রে বংশোচ্ছেদনের সম্ভাবনায় রাজাদের বহু বিবাহ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে। দশরথের সন্তান না হওয়ার কথা বাল্মীকি রামায়ণে স্পষ্ট লিখিত আছে –

সুতার্থে তপ্যমানস্য নাসীদ্ বংশকরঃ সুতঃ।
(বা০ রা০ বাল্য০ ৮/১)

অর্থাৎ সন্তানার্থ দুঃখিত দশরথের বংশ চালনা করার কোন পুত্র ছিলো না।

রামের জন্মও দশরথের ৪৪ বর্ষ আয়ুতে হয়েছিল –

ঊনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ।
ষষ্টি বর্ষসহস্রামি জাতস্য মম কৌশিকঃ॥
(বা০ রা০ বাল্য০ ২০/২, ১০)

দশরথ বিশ্বামিত্র ঋষিকে বললেন হে বিশ্বামিত্র! আমার রামের বয়স ১৬ বর্ষ থেকেও কম এবং আমার আয়ু ৬০ বর্ষ থেকে বহু বা অধিক। (*সহস্রং বহুনাম নিঘন্টু*)

রাজা দশরথ অত্যন্ত ধার্মিক এবং প্রজা ও রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ রক্ষক ছিলেন –

প্রহৃষ্টমুদিতো লোকস্তুষ্টঃ পুষ্টঃ সুধার্মিকঃ।
নিরাময়ো হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষভয় বর্জিতঃ॥
ন পুত্রমরণং কেচিদ্ দ্রক্ষ্যন্তি পুরুষাঃ কৃচিৎ।
নার্যশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যন্তি পতিব্রতাঃ॥
ন চাগ্নিজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপ্সু মজ্জন্তি জন্তবঃ।
ন বাজজং ভয়ং কিঞ্চিন্নাপি জ্বরকৃতং তথা॥
ন চাপি ক্ষুদ্ভয়ং তত্র ন ত রভয়ং তথা।

নগরাণি চ রাষ্ট্রানি ধনধান্যযুতানি চ ॥
নিত্যং প্রমুর্দিতাঃ সর্বে যথা কৃতযুগে তথা।
(বা০ রা০ বাল্য০ ১/৯০-৯৪)

দশরথের রাজ্যে প্রজাগণ, হৃষ্টচিত্ত, প্রসন্ন, পুষ্ট, ধার্মিক, নীরোগ, দুর্ভিক্ষভয়শূন্য ছিলো। কেউ পুত্রমরণ দেখতো না, স্ত্রীগণ অবিধবা ও পতিব্রতা ছিলো, অগ্নির ভয় ছিলো না, কোন লোক জলে ডুবে মারাও যেত না। বায়ুভয় ছিলো না। না ছিলো জ্বর, দুর্ভিক্ষ ও চোরের ভয়। নগরও রাষ্ট্র ধনধান্যযুক্ত ছিলো এবং সকলেই আনন্দিত ছিলো যেমন সত্যযুগে হওয়া উচিত।

রামায়ণ কৈকেয়ী একটি প্রধান চরিত্র। সমস্ত রামায়ণ বা রামচরিতের এটাই অভিনায়ক বা অভিরূপক। কৈকেয়ীকে রামায়ণে অত্যন্ত নিকৃষ্ট চরিত্র গণ্য করা হয়ে থাকে। কৈকেয়ী অতিদুষ্টা, অতিদোষী ও অপরাধিনী আবাল বৃদ্ধ বনিতা এক বাক্যে সেটা স্বীকার করে। কিন্তু আমাদের মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। কৈকেয়ী দুষ্টা, অতিদোষী বা অপরাধিনী ছিলেন না একথা আমরা স্বকল্পনা দ্বারা নয় বরং বাল্মীকি রামায়ণের বচন দ্বারা স্পষ্ট করতে চাই।

যখন রামের রাজ্যভিষেকের ঘোষণা হয় তখন কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা তা শুনে এবং সব দিক চিন্তা করে কৈকেয়ীকে বলে –

উত্তিষ্ঠ মূঢ়ে কিং শেষে ভয়ং ত্বামভিবর্ততে।
উগ্রত্বং রাজধর্মানাং কথং দেবি ন বুধ্যসে॥
(বা০ রা০ অযো০ ৭/১৪, ২৩)

হে মূঢ় কৈকেয়ী। ওঠ, কী শুয়ে থাকে ? তোর উপর ভয় এসে পড়েছে। তুই রাজধর্মের উগ্রতা কেন বুঝতে পারছিস না ?

পুনরায় —

অপবাহ্য তু দুষ্টাত্মা ভরতং তব বন্ধুষু।
কল্যে স্থাপয়িত্বা রামং রাজ্যে নিহতকণ্টকে॥
(বা০ রা০ অযো০ ৭/২৬)

দুষ্ট দশরথ ভরতকে তোর পিত্রালয় প্রেরণ করে প্রাতঃকালেই রামকে অভিষেক করে রাজ্যে স্থাপিত করে দিবে।

এতখানি রহস্যময় কটু শব্দের উত্তর কৈকেয়ী কী দিলেন, দেখুন –

দত্ত্বা ত্বাভরণং তস্যৈ কুবজায়ৈ প্রমদোত্তমা।
কৈকেয়ী মন্থরাং দৃষ্টা পুনরব্রবীদিদম্॥
ইদং তু মন্থবে মহ্যমাখ্যাতং পরমং প্রিয়ম।
এতন্মে প্রিয়মাখ্যাতং কিংবা ভূয়ঃ করোমি তে॥
রামে বা ভরতে বাহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে।
তস্মাতুষ্টাস্মি যদ্রাজা রামম্ রাজ্যঽভিষেক্ষতি॥
(বা০ রা০ অযো০ ৭/৩৩-৩৫)

কৈকেয়ী উক্ত কথা শ্রবণ করা মাত্র দাসী মন্থরাকে পুরস্কার স্বরূপ অলঙ্কার প্রদান করে বললেন হে মন্থরা ! তুই আমাকে আমার পরম প্রিয় কথা শুনিয়েছিস যে কাল রামের রাজ্যাভিষেক হবে। বল, তুই যে আমাকে প্রিয় সংবাদ শোনালি, এর জন্য তোকে আমি আর কী দিতে পারি ? রাম ও ভরত মধ্যে আমি কোনো পার্থক্য দেখিনা। রাজ্য ভরত পাবে কি রাম পাবে এ নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই কেননা আমার কাছে উভয়ই সমান। সুতরাং আমি আনন্দিত যে, দশরথ রামের রাজ্যাভিষেক করবেন।

এবং —

ধর্মজ্ঞো গুনবান দান্তঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবান শুচিঃ।
রামো রাজসুতো জ্যৈষ্ঠো যৌবরাজ্যমতোঽর্হতি॥
কিমিদং পরিতপ্যসে। যথাবৈ ভরতো মান্যস্তথা ভুয়োঽপি রাঘবঃ।
কৌশল্যাতোঽতিরিক্তং চ মম শুশ্রুষতে বহু॥
(বা০ রা০ অযো০ ৮/১৪-১৮)

হে মন্থরা ! রাম ধর্মজ্ঞ, গুণবান, জিতেন্দ্রিয়, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও পবিত্র। রাম রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুতরাং সে রাজ্য প্রাপ্ত করার অধিকারী। তুই বৃথা কেন দুঃখী হচ্ছিস ? ভরত অপেক্ষা রাম আমার কাছে বেশি মান্য কেননা ভরতের চেয়ে রাম আমার বেশি সেবাশুশ্রূষা করে।

কৈকেয়ীর এইরূপ সদুত্তর দেওয়া তাঁর দুষ্ট স্বভাবযুক্ত হওয়া মিথ্যা প্রমাণ করে। গোস্বামী তুলসী দাস কৈকেয়ীকে দুষ্টা সম্বোধন করে বলেছেন- **"ঢোল গঁবার পশু অওর নারী, ইয়ে সব**

তাড়ন কে অধিকারী" – যা বস্তুতঃ নারী জাতির পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক। যাই হোক, কৈকেয়ীর চিন্তাধারায় পরিবর্তন হলো যখন মন্থরা নিম্ন বচন বলে –

অনর্থদর্শিনী মৌখ্যান্নাত্মানমববুধ্যাসে।
শোকব্যসনবিস্তীর্ণে মজ্জন্তী দুঃখসাগরে ॥
ভবিতা রাঘবো রাজা রাঘবস্য চ য়ঃ সুতঃ।
রাজবংশাতু ভরতঃ কৈকেয়ি পরিহাস্যাতে ॥
ধ্রুবং তু ভরতং রামঃ প্রাপ্য রাজ্যমকণ্টকম্।
দেশান্তরং নায়য়িতা লোকান্তরমথাপি বা ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৮/২১,২২,২৭)

হে মহাদুঃখপূর্ণ সমুদ্রে নিমগ্ন অনর্থদর্শিনী কৈকেয়ী ! তুই মূর্খতাবশত নিজেকে বুঝতে অক্ষম। দেখ, রাম রাজা হবে, তার পর তার পুত্র রাজা হবে, ভরত রাজবংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এবং এটাও নিশ্চিত যে, যখন রাম নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করবে তখন সে ভরতকে কোন অন্য দেশে, সম্ভব হলে লোকান্তরে পাঠিয়ে দেবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, কৈকেয়ী এত ধার্মিক মনোবৃত্তি সম্পন্না হওয়া সত্ত্বেও মন্থরার পরামর্শ মতো ভরতকে রাজ্য প্রদান করার যুক্তি কী করে মেনে নিলেন ? রাজ সিংহাসনে বসার অধিকার রামেরই ছিলো কেননা রামই দশরথের পুত্র। এর মধ্যে একটা রহস্য নিহিত আছে। কেননা কৈকেয়ী পূর্বে অত্যন্ত উদারমনা হয়ে বলেছিলেন যে রাম ও ভরতের মধ্যে আমি কোন পার্থক্য দেখিনা। রাম রাজা হোক বা ভরত রাজা হোক আমার কাছে উভয়ই সমান। তাহলে ভরতকে রাজা করার পিছনে কী সার্থক যুক্তি থাকতে পারে ? যুক্তি অবশ্যই আছে। কৈকেয়ীর বিবাহ সময়ে কৈকেয়ীর পিতা দশরথকে শর্ত দিয়েছিলেন যে কৈকেয়ীর গর্ভে যে পুত্র সন্তান হবে সেই রাজসিংহাসনে বসবে অর্থাৎ সেই রাজ্যের প্রভু হবে। এখন এ সম্বন্ধে রামায়ণের প্রমাণ দেখুন –

সুহৃদশাপ্রমত্তাস্তাং রক্ষন্তদ্য সমন্ততঃ।

ভবন্তি বহুবিঘ্নানি কার্যান্যেব বিধানি হি ॥
বিপ্রোষিতশ্চ ভরতো যাবদেব পুরাদিতঃ।
তাবদেবাভিষেকস্তে প্রাপ্তকালো মতো মম ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৪/২৪-২৫)

দশরথ বললেন যে হে রাম ! আজ সেই অবসর যখন তোমার মিত্রগণ, প্রজাগণ তোমার পক্ষে, তারা সকলে তোমার রক্ষা করবে কেননা শুভ কার্যে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ভরত যতক্ষণ বাইরে (মামা বাড়িতে) থাকে ততক্ষণ রাজ্যাভিষেকের সময়।

এই উক্তিতে ভরতের বাইরে থাকাকালীন রাজ্যাভিষেকের সময় নির্দেশ করা ভরতের শর্তসাপেক্ষ রাজ্য পাওয়ার অধিকার সূচিত করে। এবং –

বৎস রাম চিরঞ্জীব হতাস্তে পরিপন্থিনঃ।
জ্ঞাতীন্ মে ত্বং শ্রিয়া যুক্তঃ সুমিত্রায়াশ নন্দয় ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৪/৩৯)

কৌশল্যা বললেন – হে রাম ! তুমি চিরঞ্জীবী হও। তোমার পরিপন্থী লোকেরা হত অর্থাৎ পরাস্ত হয়ে গিয়েছে। তুমি আমার ও সুমিত্রার পরিবারকে রাজলক্ষ্মীযুক্ত করে আনন্দসম্পন্ন করো।

এখানে তোমার প্রতিপক্ষী সকলে পরাস্ত হয়ে গিয়েছে এইরকম বলার অভিপ্রায় ভরতকে প্রতিপক্ষ নির্দেশ করা এবং আমার ও সুমিত্রার পরিবারকে আনন্দ সম্পন্ন করো বলার অর্থ কৈকেয়ীর পরিবারকে ত্যাগ করা স্পষ্টতঃ প্রমাণ হয়। যারা কৈকেয়ীকে দুষ্ট বলেন তাঁরা কৌশল্যার উক্ত বচন সম্বন্ধে চিন্তা করবেন, কৌশল্যার সঙ্কীর্ণ উক্তির সঙ্গে কৈকেয়ীর উদারতার তুলনা কী করে হয় ? কৈকেয়ী বলেছিলেন যে তিনি রাম ও ভরতের মধ্যে কোনো প্রভেদ দেখেন না এবং রামের রাজ্যাভিষেকে তাঁর কোন আপত্তি নেই, কৈকেয়ী তাঁর পুত্রের অধিকার জানা সত্ত্বেও এইরকম বলা নিশ্চয়ই তাঁর মনের ঔদার্য ভাব প্রকাশ করে।

এখন রামের মুখ থেকেও পরিষ্কার শুনুন যে কৈকেয়ীর বিবাহ তাঁর পুত্রের রাজ্য লাভের প্রতিশ্রুতিতেই সম্পন্ন হয়েছিল। চিত্রকূট পর্বতে রামকে ফিরিয়ে আনতে ভরত যান এবং রামকে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করতে বারংবার অনুরোধ করেন। তখন রাম তাঁকে নিম্ন বচন বলেন। যার ফলে ভরতকে নিরুত্তর হয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল –

পুরা ভ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুদ্বহন।
মাতামহে সমাশ্রৌষীদ্রাজ্যশুল্ক মনুত্তমম্॥
(বা০ রা০ অযো০ ১০৭/৩)

এখন সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হলো যে, কৈকেয়ীর সঙ্গে দশরথের বিবাহ তাদের দ্বারা উৎপন্ন সন্তানের রাজ্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে হয়েছিল। সুতরাং রাজ্য পাওয়ার অধিকার ভরতের ছিলো। যদি কৈকেয়ী স্বীয় পুত্রের অধিকার প্রাপ্তির জন্য সচেষ্ট হন তাহলে তাঁকে কি দুষ্টা বলা ঠিক হবে ? না-না, কৌশল্যাও রামের রাজ্যলাভে প্রসন্নতা প্রকাশ করেছিলেন এবং কৈকেয়ীর প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে ছিলেন, রামও রাজ্যভার গ্রহণ করতে শীঘ্র উদ্যত হয়েছিলেন এবং তিনিও ভরতের প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে ছিলেন।

লক্ষ্মনেমাং ময়া সার্দ্ধং প্রশাধি ত্বং বসুন্ধরাম্।
(বা০ রা০ অযো০ ৪/৪৩)

'হে লক্ষ্মণ ! তুমি আমার সঙ্গে এই পৃথিবী শাসন করো।'

লক্ষ্মণ সর্বদা রামের সঙ্গে থাকতেন। তিনি রামের আজ্ঞাকারী ছিলেন বলে রাম তাঁকে এই কথা বলেন। ভরতকে উপেক্ষা করছেন বলে রামকে অপরাধী বলা সমীচীন হবে না কেননা এ সব রাজনীতির ব্যাপার সুতরাং কৈকেয়ী অপরাধিনী ও দুষ্টা নয়, তিনি যা করেছিলেন তা রাজনীতি ও স্বীয় অধিকার প্রাপ্তির জন্য করেছিলেন সুমিত্রাও অত্যন্ত নীতিজ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। তিনি জানতেন যে, জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে রাম রাজ্যলাভ করতে পারে এবং পণবদ্ধ হওয়ার কারণে ভরত রাজ্য পেতে পারে। সেইজন্য তিনি এক পুত্র লক্ষ্মণকে রামের সহচর

করেন এবং অন্য পুত্র শত্রুঘ্নকে ভরতের সহচর করেন। যে কেউ রাজ্য লাভ করুক তার কিছু ভাগ তাঁর (সুমিত্রার) থাকবেই।

কৌশল্যা

রামের মাতা কৌশল্যা, তাঁর জীবন ধার্মিক কর্মে, প্রাণায়াম, সন্ধ্যাও হবনে অতিবাহিত হতো –

প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দনাম্।

(বা০ রা০ অযো০ ৪/৩৩)

কৌশল্যা প্রাণায়াম সহ পরমেশ্বরের ধ্যান করতেন।

এবং –

সা ক্ষৌমবসনা হৃষ্টা নিত্য ব্রত পরায়না।
অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্র বৎ কৃতমঙ্গলা॥

(বা০ রা০ অযো০ ২০/১৫)

সেই কৌশল্যা ক্ষৌম (রেশমী) বস্ত্র পরিধান করে নিত্য ব্রতপরায়ণ মন সহিত যজ্ঞ করতেন।

সুমিত্রা

জ্যেষ্ঠভ্রাতার সহচর ও আজ্ঞাকারী হওয়াও একটা মর্যাদা। সুমিত্রা তাঁর দুই পুত্রকে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুচর রূপে সমর্পণ করে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ লক্ষ্মণকে রামের এবং শত্রুঘ্নকে ভরতের কাছে সঁপে দিয়েছিলেন। রামকে বনবাসে যেতে হলো তাই লক্ষ্মণকেও সুমিত্রা রামসহ বনবাস যাওয়ার আজ্ঞা প্রদান করেন –

সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে।
রামে প্রমাদং মাকার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি ॥
ব্যসনী বা সমৃদ্ধো বা গতিরেষা তবানষ।
এষ লোকে সতাং ধর্মো যজ্জেষ্ঠবশগো ভবেৎ ॥
ইদং হি বৃততসুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম।
রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজম্।
অযোধ্যামট বীং বিদ্ধি গচ্ছতাত যথাসুখম্ ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৪০/৫,৬,৭,৯)

হে লক্ষ্মণ ! তোমাকে বনবাসের জন্য সৃজন করা হয়েছে (ঈশ্বর সৃজন করেছেন অথবা সুমিত্রা দ্বারা অনুপ্রাণিত)। রামের প্রতি যথাযথভাবে অনুরক্ত থাকবে। ভ্রাতা রামের বনগমনের সময় প্রমাদ করবে না। দুঃখ হোক সুখ হোক, তার সঙ্গে থাকাই তোমার গতি। সৎপুরুষের ধর্ম এই যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুগামী হওয়া। এই কুলের সনাতন রীতিও তাই বলে। রামকে দশরথের স্থানে এবং সীতাকে আমার স্থানে গণ্য করবে। জঙ্গলকে অযোধ্যা মনে করে বাস করবে। হে পুত্র ! তুমি রাম সহিত গমন বনে করো।

রাবণ

রাবণও রামায়ণের একটি বিশেষ চরিত্র এবং রামের প্রতিপক্ষী প্রধান চরিত্র। রাবণের সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে একটা কথা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। সেটা এই যে কয়েকজন বিদ্বানের মতে চৈত্র কৃষ্ণ চতুর্দশী তিথিতে রাবণের বধ অর্থাৎ রামের বিজয় হয়, আশ্বিন শুক্ল দশমীর দিনে নয়, যদিও প্রচলিত রূপে এই তিথিই মানা হয়। কেননা পদ্মপুরাণে চৈত্র কৃষ্ণ চতুর্দশী পর্যন্ত যুদ্ধ চলার কথা, অষ্টাদশ দিবস ধরে রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা এবং অমাবস্যায় রাবণাদির দাহ-সংস্কারের কথা বলা হয়েছে।

নিম্নে দেখুন —

অষ্টাদশদিনে রামো রাবনং দ্বৈরথ্যেবধীৎ।
সংগ্রামে তুমুলে জাতে রামো জয়ম বাপ্তবান॥
মাষশুক্লতৃতীয়ায়াশ্চৈত্র - কৃষ্ণা চতুর্দশী।
সপ্তাশীতিদিনান্যের মধ্যং পঞ্চদশাহ কম।
যুদ্ধাবহারাঃ সংগ্রামং দ্বাসপ্ততিদিনান্যভূৎ॥
সংস্কারো বাবনদীনামমাবস্যা দিন্যেভবৎ॥
(পদ্মপুরাণ পাতালখন্ড)

উক্ত কথন যথার্থ নয় কেননা এটা বাল্মীকি রামায়ণের বিরুদ্ধে, বাল্মীকি রামায়ণে কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যায় রাবণ যুদ্ধ হেতু যাত্রা করেন তাহলে পুনরায় কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশীতে তাঁর বধ কী করে সম্ভব ? আবার অমাবস্যায় দাহ-সংস্কার কেমন করে হয় ?

অভ্যুত্থানং, তুমদ্যৈবকৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী।
কৃত্বা নির্যাহ্যমাবস্যাং বিজয়ায় বলৈবৃতঃ॥
ভবদ্ভিঃ শ্বো নিহন্তাস্মি রামং লোকস্য পশ্যতঃ।

(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৯২/৬৬, ৯৩/৫)

রাবণকে মন্ত্রীরা বললেন যে আজ কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশী। আজ প্রস্তুত হয়ে আগামীকাল অমাবস্যায় সৈন্যবলসহ বিজয় হেতু যাত্রা করবেন। রাবণও বলেন – ঠিক আছে, কাল আমি আপনাদের সাহায্যে রামের হনন করবো।

যদি এখানে বলা হয় যে, আগামী মাসের কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দশীতে রাবণের বধ এবং অমাবস্যায় তাঁর দাহসংস্কার হয়েছিল তাহলে বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কোন বিরোধ হবেনা। তবুও এই কল্পনা যুক্তিসঙ্গত নয় কেননা পদ্ম পুরাণে রাবণের সঙ্গে ১৮ দিন যুদ্ধ করে রাম তাঁকে বধ করেন কিন্তু উক্ত কল্পনায় ২৯তম দিবসে রাম সহ যুদ্ধ করাকালীন রাবণের মৃত্যু হয়। এবং সমস্ত যুদ্ধকাল ৭২ দিন ধরে চলে, ইন্দ্রজিতের মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের সঙ্গে মাত্র ৪৩ দিন যুদ্ধ চলে এবং একা রাবণসহ ২৯ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলার কথা কোনোক্রমেই মান্য হতে পারে না। পদ্মপুরানে লিখিত আছে বলে তাকে প্রমাণ মানতে হবে এমণ কোনো কথা হতে পারে না। পুরাণ সবসময় মান্য এইরকম বলা যায় না। তাছাড়া পদ্মপুরাণ এই জন্য প্রামান্য হতে পারে না কেননা উক্ত গ্রন্থ্ রামায়ণ বহির্ভূত। যদি রামায়ণ বহির্ভূত কথা মানতে হয় তাহলে আশ্বিন শুক্ল দশমীতে রাম বিজয় লাভ করেছিলেন এইরকম শ্রী হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে লিখিত আছে-

সীতা দৃষ্টেতি হনুমদ্বাক্যং শ্রুত্বা্যকরোৎ প্রভুঃ।
বিজয়ং বানরৈঃ সার্দ্ধে বাসরহ্যস্মিন সমীতলাৎ॥
আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎ সব।
(শ্রী হরিভক্তি বিলাস, বিলাস ১৫)

সীতা, আমি দেখলাম হনুমানের এইরূপ কথনের পর রাম বানর সৈন্যসহ এই দিনে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে বিজয় লাভ করলেন। এই দিন বিজয়োৎসবের দিন।

উক্ত কথন বালামীকি রামায়ণের সঙ্গে সংগতিসম্পন্ন কারণ রাবণের দশ শির ছিলো এবং তিনি যুদ্ধার্থে কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যায় যাত্রা করেছিলেন। রাবণের দশ শির, প্রতিদিন এক শির

করে কর্তন করলে দশ শির কর্তন করতে দশ দিন লাগে। দশম দিনে দশম শির কর্তন করলে শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে রাবণ বধ প্রমাণিত হয়।

রাবণের দশ শিরের রহস্য

রামায়ণে রাবণের দশ শিরের উল্লেখ আছে। তাছাড়া যুদ্ধে রাম বাণ দিয়ে যে শির কাটতেন সেই স্থলে পুনরায় অন্য শির গজিয়ে উঠতো এইরকম বর্ণনাও লক্ষিত হয় –

সন্ধায় ধনুষা রামঃ শরমাশীবিষোপমম্ ॥
রাবণস্য শিরোঽচ্ছিন্দজ্জীমজ্জ্বলিত কুন্ডলম্।
তচ্ছিরঃ পতিতং ভূমৌ দৃষ্টং লোকৈস্ত্রিভিস্তদা ॥
তস্য সদৃশং চান্যদ্রাবণস্যোত্থিতং শিরঃ।
(বা০ রা০ যুদ্ধ ১০৭/৫৩,৫৪,৫৫)

রাম সর্পবিষসদৃশ বাণ ধনুকে সংযোজন করে রাবণের শির ভূপাতিত করলেন। সকলে সেই দৃশ্য দর্শন করলেন। সেই কর্তিত স্থানে পুনরায় নতুন শির গজিয়ে উঠলো।

এখন এখানে বিচার্য এই যে, শরীরের কোন অঙ্গ কর্তিত পুনরায় সেখানে সেই অঙ্গ উৎপন্ন হতে পারে না। হস্ত কর্তিত হলে পুনঃ হস্ত উৎপন্ন হতে পারে না। সেইরূপ পদ ও মস্তকের সম্বন্ধেও বুঝতে হবে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, রাবণের শিরগুলি জন্মজাত ছিলো না কেননা জন্মজাত হলে পুনরায় সেখানে শিরের উদয় হওয়া সম্ভব হতো না। রামায়ণের বচনে শিরের স্থানে অন্য নতুন শির গজিয়ে উঠলো ঠিক এইরকম শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। সেখানে শির উত্থিতং অর্থাৎ উঠে এলো এইরূপ বলা হয়েছে। সুতরাং রাবণের দশ শির কৃত্রিম বা মেকি বুঝতে হবে। রাবণাদি মায়াবী অর্থাৎ ইন্দ্রজাল বিশেষজ্ঞ ছিলেন, রামায়ণে কয়েকটি স্থলে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা মায়া রচনা করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, যেমন – মারীচ মায়াবী মৃগরূপ ধারণ করেছিলেন, রৌপ্য বিন্দু যুক্ত স্বর্ণিম দেহ তৈরি করা হয়েছিল সেইরূপও বলা হয়েছে [১]। রাবণ

লঙ্কায় রামের কৃত্রিম কর্তিত শির সীতার সম্মুখে রেখেছিলেন যে শিরের নির্মাতা ছিলেন মধুজিহ্ব নামক রাক্ষস[২]। ইন্দ্রজিৎও কৃত্রিম সীতা যুদ্ধের মধ্যে রামের সম্মুখে বধ করেছিলেন[৩]।

ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী সীতাকে রথে উপবিষ্ট করিয়ে তাঁকে বধ করলেন।

এইরূপ রাবণের দশ শির কৃত্রিম ছিলো এটা স্বীকার করা যেতে পারে। যুদ্ধকালে শত্রুকে প্রতারিত করার জন্য এইরকম কৌশল করে থাকবে যে শত্রু বাস্তবিক শির যেন ছেদন না করতে পারে যা তার নিম্নে লুকায়িত থাকতো। এই ভেদ বিভীষণ রামকে বলে দিয়েছিলেন। সেই কর্তিত স্থানে নতুন শির উঠে আসতো। এই হলো রাবণের দশ শিরের রহস্য।

---

(১) **সোবর্ণস্তং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ।**
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমুখে চর॥

(বা০ রা০ অরণ্য০ ৩৬/১৮)

হে মারীচ, তুমি সুবর্ণ চিত্র মৃগ রজতবিন্দু যুক্ত হয়ে রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে বিচরণ করো।

(২) **মোহয়িষ্যাবহে সীতাং মায়য়া জনকাত্মজাম॥**
শিরো মায়াময়ং গৃহ্য রাঘবস্য নিশাচর।

(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৩১/৭,৮)

অর্থাৎ – হে মধুজিহ্ব ! তুমি রামের কর্তিত শির তৈরি করে নিয়ে এসো। আমি তাই দিয়ে সীতাকে প্রতারিত করবো।

(৩) **ইন্দ্রজিৎ তু রথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তথা।**
বলেন মহতাবৃত্য তস্যা বধমরোচয়ৎ॥

(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৮১/৫)

ইন্দ্রজিৎ মায়াবী সীতাকে নিজ রথে বসিয়ে নিলেন, তাঁকে সকলের সামনে হত্যার পূর্ব পরিকল্পনা করলেন। এই অভিপ্রায়ে সে বানরদের সামনে গেলেন।

রাবণের বংশ

রাবণ পৌলস্ত্যবংশজ ছিলো –

পৌলস্ত্যবংশপ্রভবো রাবণো নাম রাক্ষসঃ।
(বা০ রা০ বাল্য০ ২০/১৫)

রাক্ষসেন্দ্রং মহাভাগং পৌলস্ত্যকুলনন্দনম্॥
রাবণং শত্রুহন্তারং মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতম্॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৩২/২৩,২৪)

অর্থং বা যদি বা কামং শিষ্যঃ শাস্ত্রেষ্বনাগতম্।
ব্যবস্যন্তি ন রাজানো ধর্মং পৌলস্ত্যনন্দন॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৫০/৯)

স্বয়ং রক্ষোধিপশ্চাপি পৌলস্ত্যো দেবকণ্টকঃ।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৬০/৭৬)

এই বচনগুলি দ্বারা রাবণকে *পৌলস্ত্যবংশপ্রভবম্*, *পৌলস্ত্যকুলনন্দন*, *পৌলস্ত্যো* বলা হয়েছে। রাবণ বেদবিদ্যাবিশারদ ছিলেন –

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতঃ স্বকর্মনিরতস্তথা।
স্ত্রিয়ঃ কস্মাদ্ বধং বীর মন্যসে রাক্ষসেশ্বর॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৯২/৬২)

হে রাবণ ! তুমি বেদবিদ্যাব্রতস্নাতক ও স্বকর্মপরায়ণ হয়ে স্ত্রীবধ (সীতার বধ) কেন করতে চাও ?

রাবণকে আর্যপুত্রও বলা হয়েছে –

আর্যপুত্রেতিবাদিন্যো হ নাথেতি চ সর্বশঃ।
পরিপেতুঃ কবন্ধাঙ্কাং মহীং শনিতকর্দমাম্॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১১০/৪)

রাবণের বধ হওয়ার পর তাঁর স্ত্রীগণ বিলাপ করতে থাকে। তাদের মধ্যে কয়েকজন তাঁকে 'আর্যপুত্র' এবং কয়েকজন তাঁকে 'নাথ' সম্বোধন করে তাঁর রক্তময় শরীর শবভূমির উপর পতিত হলো।

রাবণ দুষ্ট ও পাপী ছিলেন সন্দেহ নেই। রামের তুলনায় তাঁকে দুষ্ট বা পাপী বলা অযৌক্তিক নয় কিন্তু আধুনিক কালের বহু রাজা-মহারাজা অপেক্ষা তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর মধ্যে অনেক শিষ্টাচার ও মর্যাদা উচ্চ আদর্শসম্পন্ন লক্ষিত হয় যার উল্লেখ সংক্ষেপে এখানে আমরা করবো।

মহিলার সম্মুখে নত শির হয়ে কথা বলা –

তামুবাচ দশগ্রীবঃ সীতাং পরমদুঃখিতাম।
অবাক্‌শিরাঃ প্রপতিতো বহু মন্যস্ব মামিতি॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৫৮/৬৮)

রাবণ শির নত করে এবং সাষ্টাঙ্গ অবনমিত হয়ে সীতাকে বললেন তুমি আমাকে খুব ভালো গণ্য করো।

সীতাকে এক বর্ষের অবধি দেওয়া –

সা তু সংবৎসরং কালং সাময়াচত ভামিনী॥
প্রতীক্ষমানা ভর্ত্তারং রামমায়তলোচনা।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১২/১৮,১৯)

সীতা তার পতি রামের প্রতীক্ষার জন্য এক বৎসরের সময় চেয়েছে রাবণ এইরূপ মন্ত্রীদেরকে বললেন।

হস্তগত সীতাকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী রামের প্রতীক্ষা হেতু এক বৎসর সময় দেওয়া রাবণের শিষ্টাচার ও শ্রেষ্ঠ ব্যবহার প্রদর্শন করে।

রাবণের মর্যাদাবোধ –

এবং চৈতদকামাং তাং ন চ স্প্রক্ষ্যামি মৈথিলি।

(বা০ রা০ সুন্দর০ ২০/৬)

রাবণ সীতাকে বলছেন – হে সীতা ! যদি তুমি আমার প্রতি কামভাব পোষণ না করো আমি তোমাকে স্পর্শ করতে পারি না।

ধর্মশাস্ত্রে বন্ধ্যা, রজস্বলা, অকামা ইত্যাদি নারীকে স্পর্শ করার নিষেধ আছে, সুতরাং নিজের প্রতি অকামা (কামনাহীন) সীতাকে স্পর্শ না করার মর্যাদা মতো রাবণ আচরণ করেছেন। রাবণের এই মর্যাদাবোধ প্রশংসনীয়, আধুনিক কালের বহু রাজা মহারাজার চেয়ে রাবণ শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রমাণ হয়।

রাবণের অনেক গুণ কিন্তু তাঁর অধর্ম বলবান, একথা রামের মুখ থেকেও শুনুন –

অহোরূপমহো ধৈর্যমহো কান্তিরহো দ্যুতিঃ।
অহো রাক্ষসরাজস্য সর্বলক্ষণযুক্ততা॥
যদ্যধর্মো ন বলবান স্যাদয়ং রাক্ষসেশ্বরঃ।
স্যাদয়ং সুরলোকস্য সশক্রস্যাপি রক্ষিতা॥

(বা০ রা০ সুন্দর০ ৪৯/১৭,১৮)

রাবণকে দর্শন করা মাত্র রাম মুগ্ধ হয়ে যান এবং বলেন আহা ! রাবণের রূপসৌন্দর্য, আহা! কান্তি, সর্বলক্ষণযুক্ত দেহ! যদি এর মধ্যে অধর্ম বলবান না হতো তাহলে রাবণ ইন্দ্রসহিত সমস্ত দেবলোকের অধীশ্বর হয়ে যেত।

রাবণের অধর্ম বিষয়ক যে দোষগুলি ছিলো, তাঁর বধে বিলাপরতা মন্দোদরী তার গণনা এইভাবে করেছেন –

নৈকযজ্ঞবিলোপ্তারং, ধর্মব্যবস্থাভেত্তারং।

দেবাসুর নু কন্যা নামহর্তারং ততস্ততঃ ॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১১১/৫২,৫৩)

অনেক যজ্ঞের বিলুপ্তকারী, ধর্মব্যবস্থালঙ্ঘনকারী, দেব, অসুর ও মানব কন্যাদের যত্র-তত্র হরণকারী। আজ তুমি তোমার এই সব পাপ কর্মের কারণে হত হয়েছ।

এই সব অধর্ম ও পাপের কারণে রাবণ দুষ্ট বা পাপী বলে গণ্য হয়েছে নতুবা তিনি ঋষিসদৃশ ছিলেন। ময় (রাবণের স্ত্রী মন্দোদরীর পিতা) তাঁর কন্যা মন্দোদরীকে মহর্ষি পুত্রের হস্তে প্রদান করেছেন এইরূপ বলা হয়েছে –

এবমুক্তস্তদা রাম রাক্ষসেন্দ্রেন দানবঃ।
মহর্ষেস্তনয়ং বালা ময়ো হর্ষমুপাগতঃ ॥
কন্যা মনোদরী নামপত্ন্যর্থে প্রতিগৃহ্যতাম্।
(বা০ রা০ উত্তর০ ১৫/১৬,১৯)

দানব ময় মহর্ষি বিশ্রবার সেই পুত্রের [রাবণের] পরিচয় পাওয়ার পর অতি প্রসন্ন হলেন এবং তাঁর সাথে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হলেন। তিনি তখন রাবণকে বললেন মন্দোদরীকে নিজ পত্নী রূপে স্বীকার করো।

রাম

রামায়ণে রাম মুখ্য সৎপাত্র। রামের জীবন অত্যন্ত আদর্শময়। রামের জীবন থেকে বহু শিক্ষা পাওয়া যায়। রামের জীবনের মহত্ত্ব প্রদর্শন করার পূর্বে রামের উপর আরোপিত কয়েকটি অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

১. রাম শূপর্ণখার নাসিকা এবং কর্ণ ছেদন করেছিলেন। রাম একটি নারীকে আঘাত করে ঠিক করেননি, মর্যাদা লঙ্ঘন করেছেন।

২. রাম বনে-জঙ্গলে মৃগ অর্থাৎ হরিণের মতো নিরীহ পশু বধ করেছিলেন। এর দ্বারা তাঁর হিংসার আশ্রয় নেওয়া এবং মাংসাহার করা উভয় দোষ প্রমাণ হয় যা কোনো মহাপুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করতে যথেষ্ট।

আলোচনা —

১. রাম রাজকুমার ছিলেন। এটা রাজধর্মের বিষয় যে, যদি কোন নারী পাপবশত দণ্ডনীয়া হয় তবে তাকে অবশ্যই দণ্ড দিতে হবে। দেখুন, বিশ্বামিত্র মুনি তাড়কা-বধের জন্য রামকে কী আদেশ দিয়েছিলেন –

নহি তে স্ত্রীবধকৃতে ঘৃণা কার্যা নরোত্তম।
চাতুর্বণ্য-হিতার্থে হি কর্তব্যং রাজসূনুনা॥
(বা০ রা০ বাল্য০ ২৫/১৭)

হে রাম ! তোমার স্ত্রীবধে ঘৃণা করা উচিত নয়। চাতুর্বর্ণের হিতার্থে স্ত্রীবধও রাজপুত্রের কর্তব্য, কেননা –

নৃশংসমনৃশংসং বা প্রজারক্ষণ-কারনাৎ।

পাতকং বা সদোষং বা কর্তব্যং রক্ষতা সদা ॥
রাজ্যভার-নিযুক্তানামেষ ধর্মঃ সনাতনঃ।
অধর্ম্যো জহি কাকুৎস্থ ধর্মো হাস্যাং ন বিদ্যতে ॥
শ্রুয়তং হি পুরা শক্রো বিরোচন সুতাং নৃপ।
পৃথিবীং হন্তমিচ্ছন্তীং মন্থরামভ্যসূদয়ৎ ॥
বিষ্ণুনা চ পুরা চ রাম ভৃগুপত্নী পতিব্রতা।
অনিন্দ্রং লোকমিচ্ছন্তী কাব্যমাতা নিষুদিতা ॥
এদৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ রাজপুত্রৈমহাত্নভিঃ।
অধর্মসহিতা নার্যো হতাঃ পুরুষসত্তম।
তস্মাদেতাং ঘৃণাং ত্যজ্ব জহি মচ্ছাসনানৃপ ॥
(বা০ রা০ বাল্য০ ২৫/১৮-২২)

হিংসা হোক অহিংসা হোক, পাতক হোক বা দোষযুক্ত হোক কিন্তু প্রজারক্ষণ হেতু রাজ্য সঞ্চালনকারীদেরকে এইরকম কর্ম করতে হয়, এটাই সনাতন ধর্ম। হে রাম ! এই তাড়কা পাপিনী, এর মধ্যে কোনো ধর্ম নেই। অতএব, তুমি এর বধ করো। এইরূপ দুষ্টা পাপিনী স্ত্রীদের বধ পুরাকালে প্রাচীন রাজপুত্রেরাও (রাজারা) করেছেন। ইন্দ্র পৃথিবী বংসকারিনী বিরোচন-পুত্রী মন্থরার হনন করেন। বিষ্ণু ভৃগুপত্নী কাব্যমাতার বধ করেন। এইরূপ বহু মনীষী রাজন্যবর্গও অধর্মযুক্তা স্ত্রীদের বধ করেছিলেন। সুতরাং ঘৃণা ত্যাগ করে আমার আদেশে এই তাড়কাকে হত্যা করো।

২. দ্বিতীয় অভিযোগ যে, রাম বনে-জঙ্গলে মৃগ অর্থাৎ হরিণের মতো নিরীহ প্রাণীদের বধ করেছেন। এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মৃগের অর্থ হরিণই গ্রহণ করা উচিত নয় কেননা মৃগের অর্থ সিংহাদি বন্য পশু। রাম রাজকুমার ছিলেন, সিংহাদি বন্য পশুর বধ করা তাঁর পক্ষে অন্যায় নয়, সুতরাং রাম তাদের হত্যা করতে পারেন, মৃগের অর্থ সিংহাদি বন্য পশু এই বিষয়ে কয়েকটি প্রমাণ নিম্নে দেওয়া হলো –

(ক) আমি যখন সর্বপ্রথম পর্বতযাত্রা করি এবং একটি ধর্মশালায় (কাংড়ী জেলা) উপস্থিত হই তখন আমাকে বলা হলো যে আপনি উপরের রাস্তায় যাবেন না কেননা ওদিকে মৃগ এসেছে।

পরে জানলাম যে ওখানকার লোকেরা চিতাকে মৃগ বলে।

(খ) সিংহাদি বন্য পশুর শিকার করাকে 'মৃগয়া' বলে। এর দ্বারাও মৃগের অর্থ সিংহাদি বন্য পশু বোঝায়।

(গ) সংস্কৃত সাহিত্যে সিংহকে 'মৃগেন্দ্র' বলা হয়। যেমন 'নরেন্দ্র' এর অর্থ যে নরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নর, সেইরূপ যে মৃগদের মধ্যে মৃগ রাজা সেই মৃগেন্দ্র সিংহও মৃগ। অতএব, মৃগের অর্থ সিংহাদি বন্য পশু।

(ঘ) বেদেও মৃগের অর্থ সিংহাদি বন্য পশুঃ যেমন – **মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠঃ।** [ঋগ্বেদ ১/১৫৪/২]

এখানে মৃগ সমান ভয়ংকর নিশ্চয়ই হরিণের মতো নিরীহ পশু হতে পারে না কিন্তু সিংহের মতো ভয়ংকর পশু অর্থেই ব্যবহৃত।

(ঙ) রামায়ণের অন্তঃসাক্ষীও মৃগের অর্থ সিংহাদি বন্য পশুর সম্বন্ধে লক্ষ্য করুন –

ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা নানাব্যালমৃগায়ুতাম্।
উবাচ লক্ষ্মণং রামো ভ্রাতরং দীপ্ততেজসম্॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ১৫/১)

রাম নিজ ভ্রাতা লক্ষ্মণকে বললো – নানা প্রকারের সর্প, হিংসক জন্তু দ্বারা পরিপূর্ণ এই পঞ্চবটী। এখানে হিংস্র জন্তুর অর্থ মৃগ হয়েছে অতএব মৃগের অর্থ সিংহাদি বন্য পশু প্রমাণ করে। এবং –

দীপ্তজিহ্বো মহাকায়স্তীক্ষ্মদ্রংষ্ট্রো মহাবলঃ।
ব্যচরং দন্ডকারন্যং মাংসভক্ষো মহামৃগাঃ॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৩৯/৩)

এখানে মারিচ মায়ামৃগের রূপ কেমন ধারণ করেছিল তার বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। প্রদীপ্ত জিহ্বাধারী, বিশাল আকারযুক্ত, তীক্ষ্ণদন্ত সম্পন্ন, মহাবলবান, মাংসভক্ষক, মহামৃগ হয়ে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করেছিল। উক্ত বচনে সমস্ত বিশেষণ মৃগের অর্থ সিংহের ন্যায় বন্য পশু প্রতিপন্ন করে।

মৃগ সম্বন্ধী এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, যদি রাম মৃগ মেরে থাকে তাহলে সিংহাদি বন্য পশুই মেরেছেন। এখন রইলো রামের মাংসভক্ষণের কথা। রাম মাংস খেতেন না –

ন রাঘবো মাংসং ভুঙক্তে নচৈব মধু সেবনে॥

(বা০ রা০ সুন্দর০ ৩৬/৪১)

হনুমান সীতাকে বলে যে, রাম মাংসভক্ষণ ও মদিরাপান কিছুই করেন না।

রাম হরিণের মতো নিরীহ পশু মেরেছিলেন বা তিনি মাংস খেতেন এই সন্দেহের নিবারণ করা হলো। এখন, রামের গুণ সম্বন্ধে দেখুন –

রামের পাণ্ডিত্য —

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো॥

(বা০ রা০ বাল্য০ ১/১৪)

রাম বেদবেদাঙ্গ তত্ত্ববেত্তা ছিলেন।

সর্ববিদ্যাব্রতস্নাতো যথাবৎ সাঙ্গবেদবিৎ।

(বা০ রা০ অযো০ ১/২০)

রাম সর্ববিদ্যাব্রত স্নাতক তথা যথাবৎ বেদাঙ্গ জ্ঞাতা ছিলেন।

রামের সদগুণ —

ক্ষমা য়স্মিং স্তপস্ত্যাগঃ সত্যং ধর্ম কৃতজ্ঞতা।
অপ্যহিংসা চ ভূতানাং তমৃতে কা গতির্মম॥
(বা০ রা০ অযো০ ১২/৩৩)

দশরথ বললেন – হে কৈকেয়ী ! যে রামের মধ্যে ক্ষমা, তপ, ত্যাগ, সত্য, ধর্ম ও কৃতজ্ঞতা এবং সর্বপ্রাণীদের জন্য দয়া বর্তমান সেই রাম ব্যতিরেকে আমার কী গতি হবে ?

পিতার আজ্ঞাপালনশীলতা —

এতাভ্যাং ধর্মশালাভ্যাং বনং গচ্ছেতি রাঘব।
মাতাপিতৃভ্যাসুক্তোঽহং কথমন্যৎ সমাচরে॥
(বা০ রা০ অযো০ ১০১/২২)

রাম বললেন – এই ধর্মশীল মাতাপিতা আমাকে বনবাসে যাওয়ার আজ্ঞা প্রদান করলেন আমি তা কী করে উলঙ্ঘন করতে পারি।

রামের উদারতা —

য়া প্রীতির্বহুমানশ্চ ময়্যযোধ্যানিবাসিনাম্।
মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেন ভরতে সা বিধীয়তে॥
(বা০ রা০ অযো০ ৪৫/৬)

বনবাস গমন করার সময় রাম বললেন হে অযোধ্যানিবাসীগণ! আপনারা আমার সঙ্গমে প্রীতি ও বহুমান্যতা বজায় রেখেছেন, আমাকে প্রসন্ন করার জন্য ভরতের সঙ্গেও সেই রূপ করবেন।

এটা রামের অত্যন্ত উদারতা যে রাজ্য ত্যাগ করা কালীন প্রজারা যাতে ভরতের সমাদরে ত্রুটি না করে সেইরূপ আদেশ দিলেন। সাধারণত দেখা যায় রাজ্য হস্তান্তরিত হলে উদারতা

প্রদর্শন করা তো দূরের কথা লোকেরা প্রজাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলতে থাকে।

রামের গুণ ভরতের তুলনায় —

নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ভরতও একটি উত্তম আদর্শ কিন্তু রামের মধ্যে বিশেষ কিছু গুণ বিদ্যমান যা ভরতের মধ্যে নেই এবং যা ভরতের পক্ষেও শিক্ষাপ্রদ –

তং প্রেক্ষ্য ভরতঃ ক্রুদ্ধং শত্রুঘ্নমব্রবীৎ।
অবধ্যাঃ সর্বভূতানাং প্রমদা ক্ষম্যতামিতি ॥
হন্যমানামিমাং পাপাং কৈকেয়ীং দুষ্ট চারিনীম্।
যদি মাং ধর্মিকো রামো নাসুয়েন্মাতৃষাতকম্ ॥
ইমামপি হতাং কুব্জাং যদি জানাতি রাঘবঃ।
ত্বাং চ মাং চৈব ধর্মাত্মা নাভি ভাষিষ্যতে ধ্রুবম্ ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৭৮/২১-২৩)

কুঁজো মন্থরাকে দেখে ক্রুদ্ধ শত্রুঘ্নকে ভরত বললেন – স্ত্রীরা অবধ্য নতুবা পাপী দুষ্টাচারিণী কৈকেয়ীকে আমি বধ করতাম এবং যদি ধার্মিক রাম এই কর্মের নিন্দা না করতেন। রাম যদি এই কুঁজোর হত্যার কথা শ্রবণ করেন তিনি নিশ্চয়ই আমাদের উভয়ের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিবেন। এবং –

ন দোষং ত্বয়ি পশ্যামি সূক্ষ্মমপ্যরিসূদন।
ন চাপি জননীং বাল্যাত্বং বিগর্হিতুর্মহসি ॥
(বা০ রা০ অযো০ ১০১/১৭)

রাম বললেন – হে ভরত ! আমি তোমার দোষ দেখিনা, এবং তুমি মাতা কৈকেয়ীর কালোচিত স্বভাবের জন্য তাঁর নিন্দা করতে পারো না।

ভরতের ত্যাগ কম নয়। তিনি রামকে ফিরিয়ে আনতে চিত্রকূট গিয়েছিলেন এবং নন্দীগ্রামে বানপ্রস্থী হয়ে কাল কাটালেন; তবুও ভরত রামের মতো সুযোগ্য নেতা ছিলেন না। রাজসভা ও প্রজাবর্গ রামকে ভালবাসতো, তারা রামকে চাইতো যেমন রামের বচনে দর্শানো হয়েছে

যে, আমার জন্য তোমাদের যে প্রীতি ও সম্মান আছে সেইরূপ ভরতের জন্যও প্রদর্শন করবে। ভরতের মুখ থেকেও রামের যোগ্যতার কথা শ্রবণ করুন –

চরিতব্রহ্মচর্যস্য বিদ্যাস্নাতস্য ধীমতঃ।
ধর্মে প্রয়তমানস্য কো রাজ্যং মদ্বিধোহরেৎ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৮২/১১)

ভরত বললেন যে, ব্রহ্মচর্য ব্রতে পূর্ণ বিদ্যাস্নাতক বুদ্ধিমান ও ধর্মাচরণে যত্নশীল রামের রাজ্যকে কে আমার ন্যায় হরণ করতে পারে ? এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, ভরত নিজেকে রাম অপেক্ষা রাজ্য পরিচালনায় যোগ্যহীন মনে করেন। শুধু তাই নয়, লঙ্কাবিজয় করার পর প্রত্যাগত রামকে রাজ্যভার সঞ্চালন করার জন্য নিজের অসমর্থ্য প্রকাশ করে ভরত বলেন –

ধ্রুবমেকাকিনা ন্যস্তাং বৃষভেন বলীয়সা।
কিশোরবদ্ গুরুং ভারং নাহং বোঢুমহমুৎসহে॥
গতিং খর ইবাশ্বস্য হংসস্যেব বায়সঃ।
নান্বেতুমুৎ সহে বীর তব মার্গমরিন্দম॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১২৮/৩,৫)

হে রাম ! বলবান বৃষভ যদি শকটভার ছোট বৎসের উপর ন্যস্ত করে তাহলে সে যেমন তা বহনে অসমর্থ সেইরূপ আমিও রাজ্যভার বহন করতে অক্ষম। যেমন অশ্বের গতি গর্দভ এবং হংসের গতি কাক প্রাপ্ত করতে পারে না সেইরূপ আপনার সম্মুখে আমার পরিস্থিতি।

রামের গুণ লক্ষণের তুলনায় —

লক্ষ্মণের ত্যাগ ও তপস্যাও আদর্শ। তিনি গৃহ ও ধর্মপত্নী ঊর্মিলাকে ত্যাগ করে রাম সহ বনবাসে যাত্রা করলেন। কিন্তু রামের মধ্যে লক্ষ্মণ অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী ছিলো যে কারণে তিনি লক্ষ্মণেরও আদর্শ ছিলেন যা সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করা হবে। প্রথমে লক্ষ্মণের ধারণা এবং পরে রামের ধারণার উল্লেখ করা হবে।

লক্ষ্মণের ধারণা –

ভরতস্যাথ পক্ষ্যো বা যো বাস্য হিতমিচ্ছতি।
সর্বাংস্তাংশ বষিষ্যামি মৃদুর্হি পরিভূয়তে॥
প্রোৎসাহিতোঽয়ং কৈকেয়্যা সন্তুষ্টো যদি নঃ পিতা।
অমিত্রভূতো নিঃ সঙ্গং বধ্যতাং বধ্যতামপি॥
(বা০ রা০ অযো০ ২১/১১,১২)

লক্ষ্মণ রামকে বললেন – যে ভরতের পক্ষ অবলম্বনে করতে চায় বা তার হিত কামনা করে আমি তাদের সকলের বধ করবো। নরম হয়ে থাকা ঠিক নয়, নরমকে সকলে চাপতে থাকে। যদি আমাদের পিতা দশরথ কৈকেয়ীর দ্বারা প্রোৎসাহিত হয়ে অসন্তুষ্ট তাহলে সেও বধযোগ্য হওয়ায় বধের পাত্র।

এইরূপ চিত্রকূটে রামকে নিয়ে যেতে ভরতের আগমন লক্ষ্য করে লক্ষ্মণ বৃক্ষোপরি আরোহন করে বললেন এই দুষ্ট ভরতকে আমি যমালয়ে পৌঁছে দেবো কেননা সে বনে আপনাকে হত্যার জন্য আসছে। রাম তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে ভরত সাক্ষাৎ করতে আসছে, তোমার ধারণা যথার্থ নয়। ভরত বা পিতাকে হত্যা করা অসৎ ও ঘৃণিত কর্ম।

পিতুঃ সত্যং প্রতিশ্রুত্য হত্বা ভরতমাহবে।
কিং করিষ্যামি রাজ্যেন সাপবাদেন লক্ষ্মণ॥
কথং নু পুত্রাঃ পিতরং হন্যুঃ কস্যাংচিদাপদি।
ভ্রতো বা ভাতরং হন্যাৎ সৌমিত্রে প্রাণমাত্মনঃ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৯৭/৩,১৬)

হে লক্ষ্মণ ! পিতৃসত্য পালনার্থ যুদ্ধে ভরতকে হত্যা করে অপবাদগ্রস্ত রাজ্যের আমি কী করবো ? কোনো অবস্থাতেই পুত্র দ্বারা পিতা ও প্রাণসদৃশ ভ্রাতার হনন কী করে সম্ভব ?

রামের গুণ রাবণের তুলনায় —

রামের সঙ্গে রাবণের তুলনা কী করে হতে পারে ? রাবণ একজন ব্যক্তি যিনি রামের কুটির থেকে সীতাকে বলাৎ অপরহণ করেন এবং রাম সেই ব্যক্তি যিনি নিজস্থানে আগতা রাবণের

ভগ্নী শূর্পণখার দর্শন পর্যন্ত করতে চান না।

রামের বিশেষ গুণ —

আস্তিকো ধর্মশীলশ্চ ব্যবসায়ী চ রাঘবঃ।
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ২৭/৩৫)

রাম আস্তিক, ধার্মিক ও নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন। রাম মর্যাদাবান ছিলেন।

রামো ভামিনি লোকস্য চাতুর্বর্ণস্য রক্ষিতা।
মর্যাদানাং চ লোকস্য কর্তা কারয়িতা চ সঃ॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৩৫/১১)

হনুমান সীতাকে বললেন – রাম প্রজাগণ ও চাতুবর্ণের রক্ষক এবং লোক মর্যাদার স্বয়ং আচরণকারী এবং অন্যের দ্বারা আচরণ করিয়ে থাকেন।

শরণাগতকে অভয়দান —

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ ব্রতং মম॥
আনয়ৈনং হরিশ্রেষ্ঠ দত্তমস্যাভয়ং ময়া।
বিভীষিনো বা সুগ্রীবো বা যদি বী রাবণঃ স্বয়ম্॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১৮/৩৩,৩৪)

যখন বিভীষণ রামের শরণাগত হন তখন সুগ্রীবাদি তাঁকে হত্যা করতে চাইলেন। রাম বললেন আমি শরণাগত সকল প্রাণীকে অভয় দান দিয়ে থাকি। এইজন্য বিভীষণকে হত্যা না করে আমার নিকটে নিয়ে এসো। আমি তাঁকে অভয় দান দিয়েছি। বিভীষণ কেন, যদি রাবণও স্বয়ং উপস্থিত হন, তাঁকে বধ না করে নিয়ে এসো।

রাম ধর্মপরায়ণ বেদবিৎ ও অস্ত্র বিশারদ ছিলেন —

যস্মিন ন চলতে ধর্মো যো ধর্মে নাতিবর্ততে।
যো ব্রাহ্মমস্ত্রং বেদ বেদান বেদবিদাংবরঃ ॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ২৮/১৯)

যে রামে ধর্ম চলায়মান নয়, যিনি ধর্মের অতিক্রমন করেন না, বেদ বিশারদগণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি ব্রহ্মাস্ত্র কে জানেন।

স্বরাজ্যের সংস্থাপক —

রাম লঙ্কাবিজয় করে সেখানে রাজ্য করেননি। সেখানকার নিবাসী রাবণের ভ্রাতা বিভীষণকে রাজ্য প্রদান করলেন কেননা প্রতিটি দেশে নিজের দেশের রাজা হওয়া উচিত। অন্য দেশকে পদাক্রান্ত করা সমীচীন নয়, মাতাই তার শিশুকে তার প্রকৃতি অনুযায়ী তাকে পূর্ণসুখ প্রদান করতে পারে পরমাতা তা পারে না, সুতরাং রাম লঙ্কাকে স্বাধীন করে নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন।

রামরাজ্যের দৃশ্য —

ন পর্যদেবেন বিধবা ন চ ব্যালকৃতং ভয়ম।
ন ব্যধিজং ভয়ং চাসীদ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
নির্দস্যুরভবল্লোকো নানর্থং কশ্চিদস্পৃশৎ।
ন চ স্ম বৃদ্ধা বালানাং প্রেতকার্যানি কুর্বতে ॥
সর্ব মুদিতমেবাসীৎ সর্বো ধর্মপরোঽভবৎ।
রামমেবানুপশ্যন্তো নাভ্যহিংসন্ পরস্পরম্ ॥
আসন্ বর্ষসহস্রানি ততা পুত্র সহশ্রিনঃ।
নিরাময়া বিশোকাশ রামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১২৮/৯৮-১০১)

রামের শাসনকালে বিধবাদের ক্রন্দন শোনা যেত না, হিংস্র প্রাণীর ভয় ছিলো না, ব্যাধি থেকে উৎপন্ন ভয়ও ছিলো না অর্থাৎ রোগ কাউকে কষ্ট দিতো না। প্রজাগণ চোর-ডাকাতের

ভয় থেকে রহিত, কেউ কারো প্রতি অনর্থ বা পাপ করতো না। বৃদ্ধদের সম্মুখে শিশুদের মৃত্যু হতো না। সকলেই সন্তুষ্ট ছিলো, সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিলো, রামকে স্মরণে রেখে পরস্পর হিংসা করতো না, অনেক পুত্র-পৌত্র যুক্ত বংশ সহস্র বর্ষ পর্যন্ত চলত অর্থাৎ কারো বংশচ্ছেদন হতো না, প্রজারা রোগ ও শোক থেকে বিযুক্ত ছিলো। রাষ্ট্রে বিধবাদের বৃদ্ধি, সিংহাদির ভয়, চোর-ডাকাতের ভয়, ব্যবহারিক অনর্থ, বাল্যমৃত্যু, পারস্পরিক বিবাদ, বংশচ্ছেদন ইত্যাদির কারণ নেতা রাজার অনুচিত শাসন। বাল্যবিবাহ, বৃদ্ধ বিবাহ, বন-জঙ্গলের অনিয়ন্ত্রণ, প্রজাদের অসুরক্ষা, চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় এবং খাদ্যবস্তুর ন্যূনতা রাজ্যের দুর্ব্যবস্থার পরিণাম।

রামের জীবন বেদানুযায়ী ছিলো —

ইন্দ্র আসাং নেতা বৃহস্পতির্দক্ষিণা যজ্ঞঃ পুর এতু সোমঃ।
দেবসেনানামভিভঞ্জতীনাং জয়ন্তীনাং মরুতো যন্ত্বগ্রম ॥
(ঋগ্বেদ ১০/১০৩/৮)

অর্থঃ যে সেনার নেতা ইন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যুৎ সদৃশ শক্তিসম্পন্ন, বৃহস্পতি অর্থাৎ পূর্ণ বিদ্বান, দক্ষিণ যজ্ঞ অর্থাৎ বুদ্ধিমান সঙ্গতিকারক, সোম অর্থাৎ গভীর বুদ্ধিসম্পন্ন হয় তাহলে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিজয় পথে দিব্যসেনাদের বীর অগ্রসর হতে থাকে।

রাম ইন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যুৎসম ক্ষিপ্র ও শক্তিসম্পন্ন ছিলেন যার ফলে বনজাতির মধ্যে বীরত্বের সমাবেশ ঘটাতে সক্ষম হয়োছিলেন। বৃহস্পতি অর্থাৎ পূর্ণ বিদ্বান ছিলেন যে কারণে বিভীষণ কে হত্যা না করে তাঁকে জীবিত ডেকে নেন। সেই বিভীষণের দ্বারাই ইন্দ্রজিত দ্বারা কৃত্রিম সীতা বধের ভেদ জ্ঞাত হয়ে আত্মহত্যা থেকে বেঁচে গেলেন এবং বিভীষণের পরামর্শে রাবণের মস্তক ছেড়ে তাঁর বক্ষস্থলে প্রহার করে তাঁকে বধ করতে সক্ষম হলেন, তিনি বুদ্ধিমান সঙ্গতিকারক ছিলেন বলে সব কার্য সুষ্ঠুমতো পূর্ণ করতে পারলেন। সোম অর্থাৎ গভীর

বুদ্ধিসম্পন্ন ও শান্ত হওয়ার কারণে তিনি সব বিপত্তি এড়িয়ে নিজ সঙ্গীদের রক্ষা করতে সমর্থ হলেন। ভারতে পুনরায় এইরকম নেতার প্রয়োজন।

এ পর্যন্ত আমরা রামায়ণ-দর্পণের ব্যক্তিচরিত্র নামক পূর্বাদ্ধ সমাপ্ত করলাম। রামায়ণের অন্যান্য সিদ্ধান্ত, প্রথা, কলা-কৌশলের উপর পরবর্তীতে আলোকপাত করা হবে।

রামায়ণ দর্পণ
উত্তরার্দ্ধ

এর মধ্যে রামায়ণকালীন ধার্মিক সিদ্ধান্ত রীতি–নীতি, দেশ সম্বন্ধী বর্ণমালা, কলা-কৌশল ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।

রামায়ণে কিছু ধার্মিক বর্ণনা

সন্ধ্যা, হবনাদি নিত্য কর্ম —

আশ্বাসিতো লক্ষণেন রামঃ সন্ধ্যামুপাসত।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৫/২৩)

সীতার শোকে নিমগ্ন রাম লক্ষ্মণ দ্বারা আশ্বস্ত হয়ে সন্ধ্যা করলেন।

প্রভাতকালে চোথায় পূর্বাং সন্ধ্যামুপাস্য চ।
প্রসূচী পরমং প্রাপ্যং নিয়মেন চ।
হুতাগ্নিহোত্রমাসীনং বিশ্বামিত্রমবন্দতাম্॥
(বা০ রা০ বাল্য০ ২৯/৩১-৩২)

রাম ও লক্ষ্মণ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করে, স্নানাদি দ্বারা শুদ্ধ হয়ে, সন্ধ্যা ও পরব্রহ্মের ধ্যান করে, অগ্নিহোত্র সম্পন্ন করে উপবিষ্ট বিশ্বামিত্রের অভিবাদন করলেন।

মহিলাদের সমানাধিকার এবং তাদের সম্মান —

গতে পুরোহিত রামঃ স্নাতো নিয়তমানসঃ।
সহ পত্ন্যা বিশালাক্ষ্যা নারায়ণমুপাগময়ৎ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৬/১)

পুরোহিত প্রস্থান করার পর রাম পত্নী সহিত স্নান ও একাগ্রচিত্তে পরমাত্মার উপাসনা করলেন।

এখানে পত্নীসহিত রামের পরমাত্মার উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং নারীদেরও সন্ধ্যা করার সমানাধিকার ছিলো। কেবল পতিসহ নয় বরং একাও নারীর সন্ধ্যা করার অধিকার সূচিত হয় যেমন দেখুন, নিম্ন বচন –

সন্ধ্যায়মানা শ্যামাধ্রুবমেষ্যতি জানকী।
নদীং চেমাং শুভজলাং সন্ধ্যার্থে বরবর্নিনী॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ১৪/৪৯)

হনুমান চিন্তা করে যে, সন্ধ্যাশীলা মাতা সীতা এই শুভ জলবতী নদীর তীরে অবশ্যই সন্ধ্যা করতে আসবেন।

এই উক্তিতে স্ত্রীদেরও স্বতন্ত্রভাবে সন্ধ্যা করার অধিকার সূচিত করা হয়েছে।

প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মানা জনার্দনাম্।
(বা০ রা০ অযো০ ৪/৩৩)

কৌশল্যা প্রাণায়ামসহ পরমাত্মার ধ্যান করতেন।

নারীদের সন্ধ্যা করার অধিকার ছাড়া হবন করার অধিকারও প্রাপ্ত ছিলো। সেটাও দেখুন –

সা ক্ষৌমবসনা হৃষ্টা নিত্য ব্রত পরায়না।
অগ্নিং জুহোতি স্ম তদা মন্ত্র বৎ কৃতমঙ্গলা॥
(বা০ রা০ অযো০ ২০/১৫)

কৌশল্যা ক্ষৌম (রেশমী) বস্ত্র পরিধান করে ব্রত পরায়ণা হৃষ্টচিত্তে মন্ত্রসহ হবন করতেন।

দীক্ষার অধিকার —

শ্রীমানশ্চ সহপত্নীভিঃ রাজা দীক্ষামুপাবিশৎ ॥

(বা০ রা০ বাল্য০ ১৩/৪১)

মহারাজা দশরথ পত্নীসহ দীক্ষাগ্রহণ করলেন।

এখানেও দীক্ষায় স্ত্রীদের সমানাধিকার দর্শানো হয়েছে।

নারীকে দেখে কোপশান্তি ও অবাঙ্মুখতা —

সতাং সমীক্ষ্যৈব হরীশ পত্নীং তস্থাবুদাসীনতয়া মহাত্মা।
অবাঙ্গমুখোঽভুন্মনুজেন্দ্র পুত্রঃ স্ত্রীসংনিকর্ষাদ্বিনিবৃত্ত কোপা ॥

(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৩৩/৩৯)

তারা নামক বালিপত্নীকে দেখে লক্ষ্মণ স্তব্ধ অবাঙ্মুখ দাঁড়িয়ে পড়েন এবং সেই নারীর সম্মুখে ক্রোধরহিত হয়ে গেলেন।

নারীকে দেখে ক্রোধরহিত ও অবান্মুখ হয়ে যাওয়া নারীকে সম্মান করা বুঝায়।

পতিব্রত ধর্ম সদৃশ পত্নীব্রত ধর্মও বলা হয়েছে —

মোঘো হি ধর্মশ্চরিতো মমায়ং তথৈকপত্নীত্বমিদং নিরর্থকম্।

(বা০ রা০ সুন্দর০ ২৮/১৩)

রাম সীতার অপহরণের পর দুঃখের সহিত বললেন যে আমি ব্যর্থ ধর্মাচরণ করলাম এবং এক পত্নীব্রতও নিরর্থক হয়ে গেলো।

এই উক্তি দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, স্ত্রীই কেবল পতিব্রত ধর্ম পালন করবে এমন নয়, পুরুষকেও পত্নীব্রত ধর্ম পালন করতে হয়।

বাল্মীকি রামায়ণে নিয়োগ প্রথা —

স্ত্রী বিধবা হলে দেবরের সঙ্গে নিয়োগ –

রামপ্রসাদাৎ কীর্তিং চ কপিরাজ্যং চ শাশ্বতাম্।
প্রাপ্তবান্ হি সুগ্রীবো রুমাং মাং চ পরন্তপ ॥
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৩৫/৫)

তারা (বালিপত্নী) লক্ষ্মণকে বললেন যে, রামের দয়ায় সুগ্রীব যশ, স্থায়ী কপিরাজ্য, রুমাকে এবং আমাকে প্রাপ্ত করেছে।

রামের দ্বারা বালি হত হলে তাঁর পত্নী তারাকে সুগ্রীব তাঁর পত্নী করে নিয়েছিলেন।

পতির জীবিতকালে তার দ্বারা পরিত্যক্ত স্ত্রীর দেবরাদি দ্বারা নিয়োগ –

নাস্তি যে ত্বয়্যভিস্বঙ্গো যথেষ্টং গম্যতামিতঃ ॥
তদদ্য ব্যাহৃতং ভদ্রে মমৈতৎ কৃত বুদ্ধিনা।
লক্ষ্মণে বাথ ভরতে কুরু বুদ্ধিং যথাসুখম্ ॥
শত্রুঘ্নে বাথ সুগ্রীবে রাক্ষসে বা বিভীষণে।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১১৫/২১,২২,২৩)

লঙ্কাবিজয়ের পর রামের সম্মুখে সীতা আনীত হলে সীতাকে দেখে রাম তাঁকে বললেন – তুমি পর-পুরুষের অধীন ছিলে, এখন তুমি আমার ব্যবহারযোগ্য নও। তোমার মধ্যে আমার প্রতি প্রেম ও আকর্ষণ নেই। যথেচ্ছ চলে যাও, আজ আমি নিশ্চিত ঘোষণা করে বললাম। লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব অথবা বিভীষণের প্রতি তুমি মননিবদ্ধ করতে পারো।

এখানেও এটা স্পষ্ট যে, নিয়োগের প্রথম অধিকার ভাইয়ের, তৎপশ্চাৎ অন্য লোকের।

ক্রোধবিজয় মহান পুরুস্কার —

য়ঃ সমুৎ পতিতং ক্রোধং ক্ষময়ৈব নিরস্যতি।
যথোরসস্ত্বচং জীর্ণে স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৫৫/৬)

যে মনুষ্য উত্থিত ক্রোধকে সেইরূপ নিরাকৃত করে দেয় ত্যাগ করে যেমন সর্প তার কেঁচুলি (খোলস) ত্যাগ করে সেই ব্যক্তি পুরুষ্কার সম্পন্ন বলা হয়।

অতিস্নেহ (মোহ) সঙ্গত নয় —

স্মৃতা বিয়োগজং দুঃখং ত্যজস্নেহং প্রিয়জনে।
অতিস্নেহ পরিষ্বঙ্গাদ্ বর্তিরাদ্রাপি দহ্যতে॥
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ১/১১৬)

লক্ষ্মণ রামকে বললেন যে, প্রিয়জনের বিয়োগ হলে তার প্রতি স্নেহ ত্যাগ করা উচিত। কেননা তার স্মরণ করলে বিয়োগের দুঃখ শরীরকে দহন করে। অতিস্নেহ দ্বারা আর্দ্র বতিকাও প্রজ্জ্বলিত হয়। এখানে অতিস্নেহকে এখানে দোষরূপে অভিহিত করা হয়েছে।

সত্যের মহিমা —

সত্যমেবেশ্বরো লোকে সত্যেধর্মঃ সদাশ্রিতঃ।
সত্যমূলানি সর্বানি সত্যান্নাস্তি পরমং পদম্॥
ভূমিঃ কীর্তিযশো লক্ষ্মীঃ পুরুষং প্রার্থয়ন্তি হি।
সত্যং সমনুবর্তন্তে সত্যমেব ভজেত তৎ॥
(বা০ রা০ অযো০ ১০৯/১৩,২২)

এই সংসারে সত্যই ঈশ্বর, সত্যই ধর্ম, সত্যই সর্বদা বিদ্যমান থাকে। সব কিছু সত্যের মূলে স্থিত, সত্য ছাড়া পরম পদ কিছু নেই। সত্য দ্বারাই যশ, কীর্তি, লক্ষ্মী এই সমস্ত কিছু যেসব মনুষ্যকে কামনা করে তাঁরা সত্যকে অনুসরণ করে। সুতরাং সত্যের সেবন অবশ্যই করা উচিত।

দেবতাদের আয়ু —

রূপং বিভ্রতি সৌমিত্রে পঞ্চবিংশতিবার্ষিকম্।
এতদ্ধি কিল দেবানাং বয়ো ভবতি নিত্যদা॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৫/১৭,১৮)

রাম বললেন – হে লক্ষ্মণ ! দেবতাদের (বাল্য ব্রহ্মচারী বিদ্বানদের) রূপ ও আয়ু সর্বদা ২৫ বর্ষের মতো স্থির থাকে।

প্রিয়বাদী বহু কিন্তু হিতকর কটুভাষী অল্প —

সুলভাঃ পুরুষা রাজন সততং প্রিয়বাদিনঃ।
অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১৬/২১)

এই সংসারে প্রিয়বাদী (তোষামোদকারী) বহু কিন্তু হিতকর কটু বক্তা ও শ্রোতা দুর্লভ।

সংযোগ-বিয়োগ, লাভ-ক্ষতি, জীবন-মরণ প্রবহমান —

সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছয়াঃ।
সংযোগা বিয়োগান্তা মরনান্তং চ জীবিতম্॥
(বা০ রা০ অযো০ ১০৫/১৬)

সমস্ত সঞ্চয় (ধনসঞ্চয় ইত্যাদি) অবশেষে ক্ষীণ হয়ে যায় এবং উচ্চ স্থান অবশেষে নিম্নে পতিত হয়। সংযোগের অন্ত বিয়োগ এবং জীবনের অন্ত মরণও নিশ্চিত।

অতিবাহিত রাত্রি প্রত্যাবর্তন করে না, নদী পশ্চাৎ পদ হয় না —

অত্যেতি রজনী যা তু, সান প্রতি নিবর্ততে।
যাত্যেব যমুনা পূর্ণে সমুদ্রমুদকাকুলম্॥
(বা০ রা০ অযো০ ১০৫/১৯)

যে রাত্রি গত হয় সে রাত্রি ফিরে আসে না, নদী প্রবাহিত হয়ে অবশেষে সমুদ্রে মিলিত হয়, পুনরায় ফিরে আসে না।

বন্ধু-বান্ধব সংযোগ স্থায়ী নয় —

যথা কার্ষং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহার্নবে।

সমেত্য তু ব্যপয়েতাং কালমাসাদ্য কঞ্চন ॥
এবং ভার্যাশ্চ পুত্রাশ্চ জ্ঞাতয়শ্চ বসূনি চ।
সমেত্য ব্যবধাবন্তি ধ্রুবো হ্যেষাং বিনাভবঃ ॥
(বা০ রা০ অযো০ ১০৫/২৬-২৭)

যেমন বিভিন্ন স্থানের কাষ্ঠখণ্ড সমুদ্রে জল তাড়িত হয়ে একত্র হয়ে যায়, পুনঃ কিছু কাল পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেইরূপ স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবান্ধব ও ধন একত্র হয়ে পুনরায় তাদের বিয়োগ হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

রাম ঈশ্বরের অবতার ছিলেন না —

অস্তি কচ্ছিত্ত্বয়া দৃষ্টা সা কদম্বপ্রিয়া প্রিয়া।
কদম্ব যদি জানীষে শংস সীতাং শুবান নাম্ ॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৬০/১২)

হে কদম্ব বৃক্ষ ! যদি তুমি কদম্বপ্রেমী প্রিয়া সীতাকে দেখে থাকো, বলে দাও।

এইরূপ অজ্ঞজনের ন্যায় জড় পদার্থকে সীতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে থাকা রামকে ঈশ্বরের অবতার প্রতিপন্ন করে না।

কিম্ ত্বয়া তপ্যতে বীর যথান্যঃ প্রাকৃতস্তথা।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ২/২)

রামকে সীতার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল দেখে সুগ্রীব রামকে বুঝাতে থাকেন – হে রাম ! সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় কেন তুমি দুঃখবোধ করছো ?

রাম যদি ঈশ্বরের অবতার হতেন তাহলে এইরূপ দুঃখগ্রস্ত হতেন না এবং সুগ্রীবাদিরও সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকতো না।

করিষ্যামি যথার্থে তু কান্ডোর্বচনমুত্তমম্।
ধর্মিষ্ঠং চ যশস্যং চ স্বর্গ্যে স্যাত্তু ফলোদয়ম্ ॥

(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১৮/৩২)

রাম বললেন – আমি কাণ্ডুর বচন পালন করবো, সে বচন ধর্মানুকূল, যশোবর্ধক ও স্বর্গদায়ক।

এখানে রামের স্বর্গ কামনা করা তাকে ঈশ্বরের অবতার প্রতিপন্ন করে না।

য়থৈব মাং বনং যান্তমনুযাতো মহাদ্যুতিঃ।
অহমপ্যনুযাস্যামি তথৈবৈনং যমক্ষয়ম্॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৪৯/১৭)

শক্তিবাণের আঘাতে মৃতপ্রায় লক্ষ্মণের জন্য রাম বিলাপ করে বললেন – হে লক্ষ্মণ ! বনযাত্রার সময় তুই যেমন আমার সঙ্গে চলেছিলি আমিও তোর যমলোক যাওয়ার সময় তোর সঙ্গী হবো।

এইরূপ অধীর হয়ে যমলোক যেতে উদ্যত হওয়া রামকে ঈশ্বরের অবতার প্রমাণ করে না।

মা বীর ভার্যে বিমতিং কুরুষ লোকো হি সর্বো বিহিতো বিধাত্রা॥
তং চৈব সর্বং সুঘদুঃখযোগং লোকেশ্যব্রবীৎতেন কৃতং বিধাত্রা।
(বা০ রা০ কি০ ২৪/৪১,৪২)

রাম সুগ্রীবকে বললেন হে বীর ! ভার্যার সম্বন্ধে বিমতি অর্থাৎ মতিহীন হয়ো না, সমস্ত সংসার বিধাতা দ্বারা রচিত। সেই বিধাতার দ্বারা সুখ-দুঃখেরও যোগ হয়ে থাকে।

রাম যদি স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার হতেন তাহলে বিধাতার স্মরণ কেন করবেন ?

সামাজিক

বর্ণগুলিতে সমদৃষ্টি —

রামায়ণকালে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকলকে সমদৃষ্টি ও আদরদৃষ্টি দিয়ে দেখা হতো। এরকম নয় যেমন আজকাল হয়ে থাকে, শূদ্রকে ঘৃণা দৃষ্টি বা অনাদরদৃষ্টি দিয়ে দেখা হতো।

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চৈব সহস্রশঃ ॥
সমানয়স্ব সৎকৃত্য সর্বদেশেযু মানবম্।
(বা০ রা০ বাল্য০ ১৩/২০,২১)

দশরথের পুত্রেষ্টি যজ্ঞে বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আদেশ করলেন যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলকে সমাদরপূর্বক নিয়ে এসো।

রামের রাজ্যাভিষেকর সময় ম্লেচ্ছকেও আনত করা হয়েছিল –

ম্লেচ্ছাশ্চার্যাশ্চ যে চান্যে বনশৈলান্তবাসিনঃ ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৩/২৫)

ম্লেচ্ছ, আর্য এবং বনপর্বতবাসীও উপস্থিত হয়েছিলেন

সভার ধর্ম —

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা, বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম্।
নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি, ন তৎ সত্যং যচ্ছলে নানু বিদ্ধম্॥
(বা০ রা০ উত্তরকাণ্ড)

সে সভা সভা নয় যেখানে বৃদ্ধ নেই, সে বৃদ্ধ বৃদ্ধ নয় যে ধর্মকথা বলে না, সে ধর্ম ধর্ম নয় যার মধ্যে সত্য নেই, সে সত্য সত্য নয় যা ছলনাযুক্ত।

উত্তম, মধ্যম ও অধম মন্ত্রণার লক্ষণ —

ঐক্যমত্যমুপাগম্য শাস্ত্র দৃষ্টেন চক্ষুষা।
মনিনো যত্র নিরতাস্তমা হুর্ম মুত্তমম্॥
বহ্বীরপি মতীর্গত্বা মন্ত্রিনামর্থ নির্ণয়ঃ।
পুনর্যত্রৈকতাং প্রাপ্তঃ স মন্ত্রো মধ্যমঃ স্মৃতঃ॥
অন্যোন্যমতিমাস্থায় যত্র সম্প্রতি ভাষ্যতে।
ন চৈকমত্যে শ্রেয়োঽস্তি মন্ত্রঃ সোঽধম উচ্যতে॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৬/১২-১৪)

শাস্ত্র দৃষ্টি দিয়ে একমত হয়ে বিচারকরা যখন বিচার করে তাকে উত্তম বিচার বলে। যেখানে বিচারকগণ বহু মতভেদের উপর একমত হয়ে নির্ণয় দিবে তাকে মধ্যম বিচার বলে। যেখানে বিভিন্ন বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে সকলে একে অন্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। যেখানে ঐক্যমত হলেও কল্যাণের সম্ভাবনা থাকে না সে মন্ত্রণা বা বিচার অধম।

গুণ-কর্মের সাদৃশ্য অনুযায়ী বিবাহ —

সদৃশো ধর্মসম্বন্ধঃ সদৃশী রূপসম্পদা।
রামলক্ষ্মনয়ো রাজন সীত চোর্মিলয়া সহ॥
(বা০ রা০ বাল্য০ ৭২/৩)

এই বিবাহপ্রসঙ্গে রামের সহিত সীতার এবং লক্ষ্মণের সহিত উর্মিলার ধর্মসম্বন্ধ ও রূপসম্পদার সাদৃশ্য আছে।

নাগরিক শিষ্টাচার ও রীতিনীতি

মিত্রতায় হস্তগ্রহণ ও হস্ত পীড়ন করার শিষ্টাচার —

রোচতে যদি তে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতাঃ।
গৃহ্যতাং পানিনা পানির্মর্যাদা বধ্যতাং ধ্রুবা॥
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৫/১১)

সুগ্রীব বললেন – হে রাম ! যদি তোমাকে মিত্রতা করতে হয় তাহলে এই প্রসারিত হস্ত নিজ হস্তে গ্রহণ করুণ এবং মর্যাদা বন্ধন করুন।

এতত্তু বচনং শ্রুত্বা সুগ্রীবস্য সুভাষিতম্।
সম্পৃহৃষ্টমনা হস্তং পীভয়ামাস পানি না॥
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৫/১২)

সুগ্রীবের এই মিষ্ট বচন শ্রবণ করে রাম হৃষ্টচিত্তে সুগ্রীবের হস্তপীড়ন করলেন।

নমস্তে বলার এবং মিত্রদৃষ্টি বজায় রাখতে বলার শিষ্টাচার —

নমস্ত্যেস্ত গমিষ্যামি মৈত্রেনেক্ষস্ব চক্ষুষা।
(বা০ রা০ বাল্য০ ৫২/১৭)

বিশ্বামিত্র ঋষি বশিষ্ঠকে বললেন – আপনাকে নমস্তে, এখন আমি প্রস্থান করছি। মিত্রদৃষ্টি (কৃপাদৃষ্টি) রাখবেন।

শাসকের সামনে শির নত করে নমস্কার করার শিষ্টাচার —

রাক্ষসা রাক্ষসশ্রেষ্ঠং শিরোভিস্তং ববন্দিরে।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১১/১৩)

রাক্ষসপতি রাবণকে রাক্ষসগণ মস্তক নত করে অভিবাদন করলো।

নিজেকে ভৎসনা করার প্রথা —

মদ্যো প্রসক্তো ভবতু স্ত্রীষ্বক্ষেষু চ নিত্যশঃ।
কামক্রোধাভিভূতশ্চ যস্যার্য্যেনুমতে গতঃ॥
(বা০ রা০ অযো০ ৭৫/৪০)

ভরত নিজেকে ভৎসনা করে – সে শীঘ্রই স্ত্রীসঙ্গ ও দ্যূতক্রীড়ায় মত্ত হবে এবং কাম-ক্রোধের বশীভূত হবে যে সব কারণের ফলে রামকে বনবাসে যেতে হলো।

সমারোহের সময় পতাকা-বন্ধন করার নিয়ম —

আবধ্যন্তাং পতাকাশ্চ রাজমার্গাশ্চ সিচ্যন্তাম্॥
(বা০ রা০ অযো০ ৩/১৭)

রামের রাজ্যাভিষেকের সময় নানা স্থানে পতাকা-বন্ধন ও রাস্তায় জল সিঞ্চন করার প্রথা এই শ্লোকে স্পষ্ট।

সুগন্ধ বারি (জল) সিঞ্চন করার প্রথা —

সিক্তাং চন্দনতোয়ৈশ।
(বা০ রা০ অযো০ ৭/৩)

এখানে চন্দনজল সিঞ্চন করার কথা বলা হয়েছে।

পারিভাষিক শব্দ ও প্রবাদ বাক্য

প্রাতরাশ —

শৃনু মৈথিলী মদ্বাক্যং মাসান্দ্বাদশ ভামিনি ॥
কালেনানেন নাভ্যেষি যদি মাং চারুহাসিনি।
তত্তত্বাং প্রাতরাশার্থে সূদাশ্ছেৎস্যন্তি লেশশঃ ॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৫৬/২৪-২৫)

রাবণ সীতাকে বললেন – হে সীতা! আমার কথা শ্রবণ করো। যদি দ্বাদশ মাস ব্যতীত হওয়ার পরেও তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ না করো তাহলে পাচক তোমাকে প্রাতরাশের জন্য তোমাকে কেটে ফেলবে।

মম ত্বাং প্রাতরাশার্থমালভন্তে মহানসে।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ২২/৯)

আমার প্রাতরাশের জন্য পাচক তোমার বধ করবে।

ধ্রুবং মাং প্রাতরাশার্থে রাক্ষসঃ কল্পয়িষ্যতি।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ২৬/৩৫)

সীতা বললেন – নিশ্চয়ই রাক্ষস প্রাতরাশের জন্য আমাকে রন্ধন করবে।

নয় (আইন) —

ত্বয়্যেব হনুমন্নস্তি বলং বুদ্ধিঃ পরাক্রমঃ।
দেশকালানুবৃত্তিশ্চ নয়শ নয়পন্ডিত ॥
(বা০ রা০ কি০ ৪৪/৭)

হে হনুমান ! তোমার মধ্যে বল, বুদ্ধি, পরাক্রম আছে, দেশকালের অভিজ্ঞতা আছে এবং হে নয় (পন্ডিত), তোমার মধ্যে নয়ও (আইন) আছে।

ভক্ত (ভাতা) —

কশ্চিদ বলস্য ভক্তং চ বেতনং চ যথোচিতম্।
সম্প্রাপ্তকালং দাতব্যং দদাসি ন বিলম্বসে॥
কালাতি ক্রমনাচ্চৈব ভক্তবেতনয়োর্ভৃতাঃ।
ভর্তুরপ্যতিকুপ্যন্তি সোঽনর্থঃ সুমহান স্মৃতঃ॥
(বা০ রা০ অযো০ ১০০/৩২-৩৩)

রাম চিত্রকূটে আগত ভরতকে জিজ্ঞাসা করলেন – সৈন্যবল অর্থাৎ সৈনিকাদি কর্মচারীদের ভাতা ও বেতন যথা সময় প্রদান করো ? বিলম্ব করো না তো ? ভাতা ও বেতনকাল লঙঘন করলে ভৃত্য মালিকের উপর কুপিত হয়ে যায়, এর ফলে মহা অনর্থ ঘটে।

মহত্তর (মেথর) —

রজকাস্তন্তবায়াশ্চ গ্রামঘোষমহত্তরাঃ।
শৈলুষাশ্চ সহ স্ত্রীভির্যান্তি কৈবর্তকাস্তথা॥
(বা০ রা০ অযো০ ৮৪/১৫)

এখানে রজক (ধোপা), তন্তুবায় (তাঁতি) সহ গ্রামমহত্তর ও ঘোষমহত্তর মেথরের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে।

বিষ্টী (ভিশতির জল সিঞ্চনকারী) —

বিষ্টীরণেক সাহস্রীশ্চোদয়ামাস ভাগশঃ।
সমীকুরুত নিম্নানি বিষমানি সমানি চ॥
স্থানানি চ নিরস্যন্তাং নন্দিগ্রামাদিতঃ পরম্।
সিঞ্চন্তু পৃথিবীং কৃৎস্নাং হিমশীতেন বারি ণা॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১২৭/৬-৭)

লঙ্কা বিজয়ের পর যখন রাম অযোধ্যায় প্রবেশ করার জন্য উদ্যত হলেন তখন সহস্র বিষ্টী বা ভিশতিদের বিভাগশঃ আদেশ প্রদান করা হলো যে নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে নিম্ন ও বিষয়

স্থানগুলিকে সমান করা হোক সুন্দর স্থান তৈরি করো এবং ভূমির উপর শীতল জল সিঞ্চন করো।

ধর্মপত্নী শব্দ —

বভূব বুদ্ধিস্তু হরীশ্বরস্য য়দীদৃশী রাঘবধর্মপত্নী।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৯/৭২)

এখানে রামের পত্নী সীতাকে রামের ধর্মপত্নী বলা হয়েছে।

অশ্রুমার্জনের প্রবাদবাক্য —

তুদ্বিনাশাৎ করোম্দ্য তেষামশ্রুপ্রমার্জনম্।
(বা০ রা০ অরণ্য০ ২৯/২৪)

খর রাক্ষস রামকে বলে – হে রাম ! তুই চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস বধ করেছিস, আজ তোর বিনাশ করে তাদের সকলের অশ্রুমার্জন করবো।

রামায়ণ কালীন কয়েকটি বিশেষ বস্তু

কার্পাস ও তুলোর বস্ত্র —

বেষ্টন্তে তস্য লাঙ্গুলং জীর্ণেঃ কার্পাসিকৈঃ পটৈঃ।

(বা০ রা০ সুন্দর০ ৫৩/৬)

জীর্ণ কার্পাসের বস্ত্র দিয়ে লাঙ্গুল [লেজ] বেষ্টন করে।

ততস্তস্য বচঃ শ্রুত্বা মম পুচ্ছং সমন্ততঃ।
বেষ্টিতং শনবল্কৈশ্চ জীর্ণেঃ কার্পাসিকৈস্তথা॥

(বা০ রা০ সুন্দর০ ৫৮/১৫২)

তখন তার উক্তি শ্রবণ করে আমার পুচ্ছকে চারিদিক দিয়ে শনবল্ক (শনের খোসা) ও জীর্ণ কার্পার বস্ত্র দিয়ে বেষ্টন করে দিলো।

জলচর মনুষ্য —

অন্তর্জলচরা ঘোরা নরব্যাঘ্রা ইতি শ্রুতাঃ।

(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৪০/২৮)

জলচর ঘোর নরব্যাঘ্রের কথা শোনা গিয়েছে।

(নরব্যাঘ্র বলতে হাঙর, শার্ক জাতীয় প্রাণী বুঝাতে পারে, মনুষ্য নয়। — অনুবাদক)

রাক্ষসের স্বরূপ (*মনুষ্য জাতির শাখা*) —

জাম্ববানৃক্ষরাজশ্চ রাক্ষসশ্চ বিভীষণঃ।

এখানে জাম্ববান ও রাক্ষসও প্রাণী জাতি, কোনো অদৃশ্য পদার্থ নয়।

দদর্শ ভূমৌ নিষ্ক্রান্তং রাক্ষসস্য পদং মহৎ।

(বা০ রা০ অর০ ৬৪/৩৬)

ভূমিতে রাক্ষসের বৃহৎ পদছাপ দেখা গেলো।

এখানেও রাক্ষস দৃশ্য প্রাণীজাতি সন্দেহ নেই কেবল তাদেরকে বৃহৎ আকার সম্পন্ন বলা হয়েছে।

কিং পুনর্মদ্বিধো জনঃ।

(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১৮/২৫)

এখানে রাম বিভীষণকে নিজসদৃশ মনুষ্য বলেছেন।

রাষ্ট্র তথা রাষ্ট্রীয় বর্ণনা

রামায়ণে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের সম্পর্কেও যথেষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে নিম্নে লিখিত হলো :

রামায়ণে স্বরাজ্য শব্দ —

পরস্পর্শাত্তু বৈদেহ্যা ন দুঃখতরমস্তি মে।
পিতুর্বিনাশাৎ সৌমিত্রে স্বরাজ্যহরনাৎ তথা ॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ২/২১)

লক্ষ্মণকে রাম বললেন – হে লক্ষ্মণ ! সীতার পরস্পর্শ, পিতৃমরণ এবং স্বরাজ্য হরণ থেকে বেশী দুঃখ আমার জন্য আর কিছু হতে পারে না।

ধর্মাপদেশাত্ত্যজতঃ স্বরাজ্যং মাং চাপরণ্যং নয়তঃ পদাতিম্।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৩৬/২৯)

ভরত বললেন ধর্ম হেতু স্বরাজ্য ত্যাগ ও বনে পদব্রজে গমন রামকে পীড়া দেয়না, রাম এমনই।

উক্ত বচনেও স্বরাজ্য শব্দের উল্লেখ আছে।

রাজা প্রজাদের মাতা-পিতা —

রাজা মাতা পিতা চৈব রাজা হিতকরো নৃণাম্।
(বা০ রা০ অযো০ ৬৭/৩৪)

রাজা প্রজাদের মাতা-পিতা এবং তাদের হিতকারী।

এখানে এটা লক্ষিত হয় যে, যে রাজা প্রজাদের হিতকারী নয় সে রাজা, রাজা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয় এবং তাকে মাতা-পিতা সদৃশ মনে করাও সমীচীন নয়।

পুরোহিত (প্রাইভেট সেক্রেটারী) —

পুরোহিতস্ত্বাং কুশলং প্রাহ সর্বে চ মন্ত্রিণঃ।

(বা০ রা০ অযো০ ৭০/৩)

পুরোহিত তোমাকে ঠিক কথা বলেছেন এবং সব মন্ত্রীরাও।

উবাচ বচনং শ্রীমান বশিষ্ঠং মন্ত্রিণাং বরম্।

(বা০ রা০ অযো০ ৯৩/৬)

এখানে বশিষ্ঠ পুরোহিতকে মন্ত্রীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী বলা হয়েছে।

রাজার ১৪টি দোষ —

নাস্তিক্যমনৃতং ক্রোধং প্রমাদং দীর্ঘসূত্রতাম্।
অদর্শনং জ্ঞানবতামালস্যং পঞ্চকৃত্তত্তাম্॥
একচিন্তনমর্থানামনর্থজ্ঞৈশ্চ মন্ত্র নম্।
নিশ্চিতানামনারম্ভং মন্ত্র স্যাপরিরক্ষনম॥
মঙ্গলস্যাপ্রয়োগং চ প্রত্যুত্থানং চ সর্বতঃ।
কচ্চিত্ত্বং বর্জয়স্যেতান রাজদোষাশ্চতুর্দশ॥

(বা০ রা০ অযো০ ১০০/৬৫-৬৭)

রাম ভরতকে বললেন – হে ভরত ! তুমি নস্তিকতা, অনৃত, ক্রোধ, প্রমাদ, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানীদের অদর্শন, আলস্য, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হওয়া, অন্যের সাহায্য না নিয়ে একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, যারা যথার্থ বুঝতে অক্ষম তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা, যা নিশ্চিত তা শুরু না করা, গুপ্ত সিদ্ধান্তের রক্ষা না করা, কল্যাণকারী বস্তুর প্রয়োগ না করা সকলের সঙ্গে উঠ-বস করা — এই ১৪টি দোষকে তুমি প্রশ্রয় দিচ্ছো না তো ?

রাজা দ্বারা ঋষি সম্মান —

ভরদ্বাজাশ্রমং দৃষ্ট্বা ক্রোশাদেব নরর্ষভঃ।
জনং সর্বমবস্থাপ্য জগাম সহ মন্ত্রিভিঃ॥
পদ্ভ্যামেব তু ধর্মজ্ঞো ন্যস্তশস্ত্র পরিচ্ছদঃ।
বসানো বাসসী ক্ষৌমে পুরোধাম পুরোহিতম্॥
(বা০ রা০ অযো০ ৯০/১,২)

চিত্রকূট পর্বতে যাওয়ার সময় ভরদ্বাজ ঋষির আশ্রমের কথা শুনে ভরত এক ক্রোশ দূর থেকে মন্ত্রীদের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্রাদি ত্যাগ করে দুটি রেশম বস্ত্র পরিধান করে এবং পুরোহিতকে অগ্রবর্তী করে পদব্রজে আশ্রমের দিকে রওনা হলেন।

দূত ও চারকের (গুপ্তচরে) পার্থক্য —

নায়ং দূতো মহারাজ চারকঃ প্রতিভাতি মে।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ২০/২৯)

এ দূত নয় কিন্তু চারক।

সংগ্রামে বৈদ্য (চিকিৎসক) —

লক্ষ্মণস্য দদৌ নস্তঃ সুষেনঃ সুমহাদ্যুতেঃ।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১০১/৪৪)

লক্ষ্মণ যখন যুদ্ধে রাবণের প্রহারে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন সেই সময় তাঁর নাসিকা মধ্যে সুষেন নামক চিকিৎসক ওষধি দিয়ে সচেতন করলেন।

তানার্তান্ নষ্টসংজ্ঞাঁশ্চ গতাংসূশ্চ বৃহস্পতিঃ।
বিদ্যাভির্মন্ত্র যুক্তাভিরোষ ধীভিশ্চিকিৎ সতি॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৫০/২৮)

সংগ্রামে সেই সব আহতদের, প্রহারে অচেতনদের, মৃতপ্রায়দের, বৃহস্পতি চিকিৎসক মন যুক্ত বিদ্যা (মানসিক প্রক্রিয়া) এবং ওষধির দ্বারা চিকিৎসা করেন।

প্রজাদের সুখের জন্য রাজ্যের ব্যবস্থাসমূহ —

১. বাল্যবিবাহ ও বৃদ্ধবিবাহ প্রতিরোধ, যার ফলে রাজ্যে বিধবার সংখ্যা না থাকে।

২. সিংহাদি বন্য পশুর নিয়ন্ত্রণ এবং সর্পাদি বিষময় জন্তুর প্রতিকার, যার ফলে প্রজাগণ এদের দ্বারা পীড়িত না হয়।

৩. স্বাস্থ্যের নিয়মানুযায়ী স্থান, গৃহ, জল, খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা এবং চিকিৎসালয়ের সমুচিত স্থাপনা, যাতে রোগের আধিক্য এবং রোগ অসাধ্য অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাতে না পারে।

৪. সমিতি (পুলিশ) ইত্যাদির ঠিক মতো ব্যবস্থা হওয়া যার ফলে চোর ডাকাতের অভাব হয়।

৫. ন্যায়ালয়ের প্রতিষ্ঠা যাতে অনর্থ, পাপ, অন্যায়, প্রজাগণ একে অন্যের সঙ্গে করতে না পারে।

৬. শিশু লালন-পালন এবং তাদের চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা যাতে তাদের মৃত্যুহার কমে।

৭. ধর্মপ্রচারক, পণ্ডিত, পুরোহিত ও সাধুদেরকে বৃত্তিদান করা এবং তাঁদেরকে প্রচার ও প্রবচনের অবসর দেওয়া যার ফলে জনতা মধ্যে ধর্মপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

উক্ত তথ্যগুলির জন্য দেখুন রাম প্রকরণে রাম-রাজ্যের বর্ণনা।

সত্যাগ্রহ (ধর্না - অনশন - হরতাল) —

ইহ তু স্থণ্ডিলে শীঘ্রং কুশানাস্তর সারথে।
আর্যং প্রত্যুপবেক্ষামি যাবন্মে প্রসীদতি।॥
নিরাহারো নিরালোকো ধনহীনো যথা দ্বিজ।
শেষ্যে পুরস্তাচ্ছালায়াং যাবন্ন প্রতিযাস্যতি॥
(বা০ রা০ অযো০ ১১১/১৩-১৪)

চিত্রকূট পর্বতে রামকে ফিরিয়ে আনতে আগত ভরত সারথিকে বললেন – হে সারথি, এই বৃহৎ শিলার উপর শীঘ্র কুশ বিছিয়ে দাও। আমি রামের সম্মুখে উপবেশন করে থাকবো যতক্ষণ তিনি সন্তুষ্ট হবেন না এবং অনশনরত এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত না করে এক দৃষ্টিতে ধনহীন ব্রাহ্মণের মতো কুটির সম্মুখে শয়ন করে থাকবো যতক্ষণ রাম প্রত্যাগমন না করবেন।

দেশ

এই প্রকরণে দশরথের রাজ্যস্থান, রাবণের লঙ্কাপুরী এবং অন্যান্য দেশসম্বন্ধীয় সাধারণ কথার বর্ণনা করা হবে।

দশরথের রাজ্যস্থান —

যাবদাবর্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা ॥
দ্রাবিড়ঃ সিন্ধুমৌবীরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণপথাঃ।
বঙ্গ, মাগধা, মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ ॥
তত্র জাতং বহুদ্রব্যং ধনধান্যমজাবিকম্।
ততো বৃষ্ণীষ্ব কৈকেয়ী যদ্যত্ত্বং মনসেচ্ছসি ॥
(বা০ রা০ অযো০ ১০/৩৬-৩৮)

দশরথ কৈকেয়ীকে সান্ত্বনা দান করে বললেন – হে কৈকেয়ী ! রামকে বনবাসে পাঠিয়ো না কিন্তু সমগ্র রাজ্য তুমি গ্রহণ করো, যে পর্যন্ত সূর্য তার আবর্তন করে ততখানি আমার পৃথিবী যার মধ্যে দ্রাবিড়, সিন্ধু, মৌবীর (সিন্ধু নদী সংলগ্ন দেশ), সৌরাষ্ট্র (গুজরাত, কাঠিয়াবাড়), দক্ষিণাপথ (অবন্তীও ঋষ্য পর্বত পার করে পয়োষ্ণী নদীর দক্ষিণের দেশ), বঙ্গ, মাগধ, মৎস্য, কাশী, কৌশল দেশ সম্মিলিত। এর মধ্যে প্রচুর দ্রব্য ধন-ধান্য ইত্যাদি বস্তু উৎপন্ন হয় তুমি সেগুলির আকাঙ্ক্ষা করতে পারো।

উক্ত উক্তি দ্বারা দশরথ চক্রবর্তী সামাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন স্পষ্ট বুঝ যায়।

পৃথিব্যাং সাগরান্তায়াং যৎকিঞ্চিদধিগম্যতে।
তৎসর্বে তব দাস্যামি মা চ ত্বং মন্যুমাবিশ ॥
(বা০ রা০ অযো০ ১২/৩৫)

দশরথ বললেন – হে কৈকেয়ী ! পৃথিবী থেকে সাগর পর্যন্ত যা কিছু প্রাপ্য আমি সব তোমাকে প্রদান করবো, তুমি ক্রোধ করো না। এখানে দশরথের সাম্রাজ্য সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত

ছিল এইরকম লক্ষিত হয়।

রামায়ণ কালীন সপ্ত নদী —

হ্লাদিনী, পাবনী চৈব নলিনী, চ তথৈব চ।
তিস্রঃ প্রাচীং দিশং জগমুর্গঙ্গাঃ শিবজলাঃ শুভাঃ॥
সুচক্ষুশ্চৈব সীতা চ সিন্ধুশ্চৈব মহানদী।
তিস্রশ্চৈতা দিশ জন্মঃ প্রতীচীং তু দিশং শুভা॥
সপ্তমী চান্বগাত্তাসং ভগীরথমথং তদা।
(বা০ রা০ বাল্য০ ৪৩/১২-১৪)

হ্লাদিনী, পাবনী, নলিনী এই তিনটি নদী পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়, সচক্ষু, সীতা, সিন্ধু এই তিনটি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় এবং সপ্তম গঙ্গা (ভগীরথী)।

লঙ্কা —

লঙ্কানাম সমুদ্রস্য মধ্যে মম মহাপুরী।
সাগরেন পরিক্ষিতা নির্বিষ্টা গিরিমূর্ধ্নি॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৪৭/২৯)

রাবণ বললেন – আমার মহাপুরী লঙ্কা সমুদ্রের মধ্যে সমুদ্র পরিবেষ্টিত পর্বতের উপরে অবস্থিত।

নিবিষ্টা তস্য (ত্রিকূটস্থ) শিখরে লঙ্কা রাবণপালিতা।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৩৯/১৯)

ত্রিকূট পর্বতের শিখরে লঙ্কা অবস্থিত।

কৈলাসশিখরাকারে ত্রিকূটশিখরে স্থিতাম।
লঙ্কামীক্ষস্ব বৈদেহি নির্মিতাং বিশ্বকর্মনা॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১২৩/৩)

রাম পুষ্পকবিমানে আসীন আকাশমার্গে যাত্রা করা কালীন সীতাকে বললেন – হে সীতা ! কৈলাশ শিখর সম ত্রিকূট শিখরের উপর বিশ্বকর্মা নির্মিত লঙ্কাপুরী দর্শন করো।

রমনীয়তরং দৃষ্টা সুবেলস্য গিরেস্তটম্।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৩৭/৩৬)

সুবেল পর্বতের মতো লঙ্কা রমনীয়।

কিং পুনঃ সাগরস্যান্তং সংখ্যাতং শতযোজনম্।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ২/৪)

লঙ্কা সমুদ্রতট থেকে শতযোজন দূরে অবস্থিত।

শতর অর্থ যদি একশ নেওয়া হয় তাহলে ১০০ যোজন অর্থাৎ ৪০০ ক্রোশ বা ৫০০ মাইল হয়। যদি শতর অর্থ বহু যোজন নেওয়া হয় যেমন নির্ঘন্টুতে শত সহস্র বলতে বহুনাম, তাহলে লঙ্কা বহু যোজন দূরে অবস্থিত।

গিরেমূর্ধ্নিনস্থিতাং লঙ্কাং পান্ডুরৈর্ভবনৈঃ শুভৈঃ।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ২/১৯)

লঙ্কা পর্বতে শিখরের উপর শ্বেত গৃহগুলি চুন দ্বারা শোভিত ছিলো।

পরিক্ষিপ্তা সমুদ্রেন লঙ্কেয়ং শতযোজনা।
(বা০ রা০ অর০ ৫৫/১৯)

শতযোজন বিস্তৃত লঙ্কা সমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত।

লঙ্কা শতযোজন ৪০০ ক্রোশ অর্থাৎ ৫০০ বা ৮০০ মাইল পরিধিযুক্ত।

য়স্যাং স্তম্ভসহস্রেন প্রাসাদঃ সমলঙ্কৃতঃ।

(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৩৯/২২)

লঙ্কায় সহস্রস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ (সভাভবন) ছিলো।

সপ্তভৌমাষ্টভৌমৈশ্চ স দদর্শ মহাপুরীম্।
তলৈঃ স্ফটিকসংকীর্ণৈঃ॥

(বা০ রা০ সুন্দর০ ২/৫২)

সপ্তভূমি ও অষ্টভূমি যুক্ত গৃহ এবং স্ফটিক লাগানো তলাযুক্ত লঙ্কা হনুমান দর্শন করলো।

লতাগৃহাংশ্চিত্রগৃহান।
পুষ্পগৃহানি চ।
ক্রীড়াগৃহানি চ॥
ভূমীগৃহাং শ্চৈত্য গৃহান্ গৃহাতিগৃহকানপি।

(বা০ রা০ সুন্দর ১২/১,১৩,১৫)

লঙ্কায় লতাগৃহ, চিত্রীকৃতগৃহ, পুষ্পাবৃতগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, ভূতল গৃহ এইরূপ বহু গৃহ ছিলো।

উক্ত বচনগুলির মাধ্যমে লঙ্কার স্বরূপ বুঝুন —

১. লঙ্কা সমুদ্রের মধ্যে

২. সুবেল পর্বতের ত্রিকূট শিখরের উপর

৩. সমুদ্র তট (ভারত সমুদ্রতট) থেকে শতযোজন দূরত্বে।

৪. শত যোজন বিস্তৃত

৫. চুনের পাকা সাত-আট তলা স্ফটিকের মেঝে যুক্ত গৃহে এবং লতাগৃহ, পুষ্পগৃহ, ক্রীড়াগৃহ, ভূতলগৃহ, গৃহান্তরগৃহ যুক্ত এবং সহস্র স্তম্ভ যুক্ত সভাভবন বিশ্বকর্মা দ্বারা নির্মিত।

অর্থাৎ লঙ্কা ভারতের সমুদ্রতট থেকে শতযোজন দূরে সমুদ্রের মধ্যে সুবেল পর্বতের ত্রিকূট শিখরের উপর অবস্থিত যার রাজ্য বিস্তার শতযোজন ছিলো।

বিন্ধ্যপর্বত —

হৃষ্টপক্ষিগনাকীর্ণঃ কন্দরোদর কূটবান।
দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে বিন্দ্যোঽয়মিতি নিশ্চিতঃ॥
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৬০/৭)

সমুদ্র তটোপরি প্রসন্ন পক্ষীকূল গুহা ও শৃঙ্গ যুক্ত দক্ষিণ সমুদ্র তটে এই বিন্ধ্য অর্থাৎ পর্বত (সাধারণ পর্বতসমার্থক)। কিন্তু এখানে মনুস্মৃতি পরিভাষা অনুযায়ী হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যেকার দেশ আর্যাবর্ত বিন্ধ্যনাম পর্বত হওয়া বেশি সঙ্গত।

নগর প্রান্ত —

তক্ষং তক্ষশিলায়াং পুষ্কলং পুষ্কলাবতে।
গন্ধর্বদেশে রুচিরে গান্ধারবিষয়ে চ সঃ॥
(বা০ রা০ উত্তর০ ১০১/১১)

অঙ্গদীয়া পুরী রম্যাপ্যঙ্গদস্য নিবেশিতা।
চন্দ্রকেতোশ্চ মল্লস্য মল্লভূম্যাং নিবেশিতা॥
চন্দ্রকান্ততি খ্যাতা দিব্যা স্বর্গপুরী যথা।
অঙ্গদং পশ্চিমাং ভূমিং চন্দ্রকেতু মুদঙ্মুখম্॥
(বা০ রা০ উত্তর০ ১০২/৮,৯,১১)

ভরতের পুত্র তক্ষের তক্ষশিলা এবং পুষ্কলের গন্ধর্ব দেশে পুষ্কলাবত নগর ছিলো।

লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদের কারুপথে অঙ্গদীয়া এবং চন্দ্রকেতুর চন্দ্রকান্ত দেশে চন্দ্রকান্তা নগর ছিলো। অঙ্গদ পশ্চিম দিকে এবং চন্দ্রকেতু উত্তর দিকে ছিলো।

কলাকৌশল ও বিজ্ঞানবিদ্যা

রামায়ণে কলাকৌশল বিষয়ক বর্ণনাও যথেষ্ট লক্ষিত হয়। এই বর্ণনা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, রামায়ণের সময় কোন-কোন কলা কেমন এবং কী উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। উক্ত বর্ণনাকে আমরা নিম্ন অষ্ট বিভাগে ভাগ করতে পারি।

১. গৃহ, শালা (বাড়ি) ও সেতু।
২. নগর, উদ্যান।
৩. আয়ুধ (অস্ত্র-শস্ত্র)।
৪. হস্তশিল্প।
৫. যন্ত্র, যন্ত্রযান।
৬. বিমান।
৭. বিজ্ঞান।
৮. বিদ্যা।

এখন ক্রমশ এদের বিবরণ দেওয়া হলো —

১. গৃহ, শালা (বাড়ি) ও সেতু

চুনা বা সাদা সিমেন্টের বাড়ি —

শুক্লৈঃ প্রাসাদশিখরৈঃ কৈলাসশিখরোপমৈঃ।
(বা০ রা০ কি০ ৩৩/১৫)

শুক্লবর্ণের গৃহশিখরের এখানে বর্ণনা পাওয়া যায় যা চুন বা সাদা সিমেন্টের হতে পারে।

আরুরোহ ততঃ শ্রীমান্ প্রাসাদং হিমপান্ডুরম্।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ২৬/৫)

রাবণ বরফতুল্য শ্বেতবর্ণ প্রাসাদে আরোহণ করলেন। সে প্রাসাদ ও সাদা সিমেন্টের প্লাস্টার দিয়ে তৈরি স্পষ্ট বুঝা যায়।

কৃতানি বেশ্মানি চ পান্ডুরানি।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৭/১০)

গৃহ শ্বেতবর্ণের (চুন ইত্যাদির পালিশে সাদা) করা হয়েছিল।

মনিজড়িত মহল —

মনি, স্ফটিক ও মুক্তা দ্বারা এবং মনিচূর্ণ দ্বারা জড়িত মহল লঙ্কায় ছিলো।

সপ্ত অষ্টতলা প্রাসাদ —

সপ্তভৌমাষ্টভৌমৈশ্চ স দদর্শ মহাপুরীম্।
তলৈঃ স্ফটিক সংকীর্ণৈঃ।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ২/৫২)

সহস্র স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ —

য়স্যাং স্তম্ভসহস্রেন প্রাসাদঃ সমলং কৃতঃ।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৩৯/২২)

যে লঙ্কায় সহস্রস্তম্ভযুক্ত প্রাসাদ অর্থাৎ মভাভবন (পার্লামেন্ট হাউস সমান) ছিলো। স্থাপত্য শিল্পও অনেক উন্নত ছিলো যে, সহস্র স্তম্ভের উপর প্রাসাদ দাঁড়িয়ে ছিলো।

লতাবৃত, চিত্রাবৃত, পুষ্পাবৃত গৃহ তথা ক্রীড়াঘর, গৃহান্ত গৃহ, ভূতলঘর ইত্যাদি ছিল —

লতাগৃহাংশ্চিত্রগৃহান।
পুষ্পগৃহানি চ।
ক্রীড়াগৃহানি চ॥
ভূমীগৃহাং শৈচত্য গৃহান্ গৃহাতিগৃহকানপি।
(বা০ রা০ সুন্দর ১২/১,১৩,১৫)

লঙ্কায় রাবণ লতাবৃত, চিত্রাবৃত, ক্রীড়ায়র, ভূমিঘর, শ্মশানঘর, গৃহমধ্যে গৃহ নির্মিত ছিলো।

ভূতলগৃহ, ভূতলনগর —

অথ প্রতিসমাদিষ্টো লক্ষণঃ পরবীরহা।
প্রবিবেশ গুহাং রম্যাং কিষ্কিন্ধ্যাং রামশাসনাৎ॥
স তাং রত্নময়ীং দিব্যাং শ্রীমান পুষ্পিতকা ননাম্।
রম্যাং রত্নসমাকীর্নাং দর্দশ মহতীং গুহাম্॥
হর্ম্য প্রাসাদ সংবাধাং বানাপথোপশোভিতাম্।
সর্বকামফলৈবৃক্ষৈঃ পুষ্পিতৈরুপশোভিতাম্॥
(বা০ রা০ কি০ ৩৩/১,৪,৫)

রামের আদেশে লক্ষ্মণ মহতী ও রমণীয় কিষ্কিন্ধ্যা নামক ভূতলনগরে প্রবেশ করলেন। এর মধ্যে সুন্দর মহল ও দোকান, বাজার শোভিত এবং পুষ্পোদ্যান ও সুমিষ্ট ফলবতী বৃক্ষ লাগানো ছিলো।

এখানে ভূতলে নির্মাণকলার উচ্চতম আবিষ্কার স্পষ্ট বুঝা যায়। আজকাল লন্ডন এবং অন্যান্য বড়ো শহরে ভূতল নগর আছে। হায়দ্রাবাদ, দক্ষিণে প্রাচীন সময়ের এলোরা, এজেন্টা গুহা ইত্যাদিও সেই পুরাতন শিল্পের উদাহরণ।

সেতু তৈরি করা —

নলশ্চক্রে মহাসেতুং মধ্যেনদনদীপতেঃ।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ২২/৬৩)

নল একটি মহাসেতু সমুদ্র মধ্যে তৈরি করলেন।

ব্রহ্মা (ইঞ্জিনিয়ার) —

উক্ত গৃহশালা, প্রাসাদ, সেতু ইত্যাদির নির্মাণকর্তা ইঞ্জিনিয়ারদেরও বর্ণনা রামায়ণে পাওয়া যায়।

তানি প্রয়ত্নাভিসমাহতানি ময়েন সাক্ষাদিব নির্মিতানি।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৭/৪)

ময় ইঞ্জিনিয়ারের প্রচেষ্টায় নির্মিত ভবন ছিলো।

পুরস্তাদ্ ঋষভো নীলো বীরঃ কুমুদ এব চ।
পন্থানং শোধয়ন্তি স্ম বানরৈ বহুভিঃ সহ॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৪/৩০)

এখানে বলা হয়েছে যে, ঋষভ, নীল, কুমুদ এই তিন জন মার্গ নির্মাণ করার ইঞ্জিনিয়ার ছিলো। চতুর্থ নল সমুদ্রের উপর সেতু নির্মাণ করেছিল যেটা সেতু প্রকরণে বলা হয়েছে। নল বিশ্বকর্মার পুত্র ছিলো।

বিশ্বকর্মসুতো বীরো নলঃ প্লবগসত্তমঃ।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৩০/৩৩)

২. নগর, উদ্যান

রামায়ণকালে নগর, নগরী, পুরীর বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা নির্মাণও হতো। যেমন :
লঙ্কাকে বিশ্বকর্মা (ইঞ্জিনিয়ার) তৈরি করেছিলেন —

লঙ্কামীক্ষস্ব বৈদেহি নির্মিতাং বিশ্বকর্মনা।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১২৭/৩)

ভূতল নগর —

ভূতলনগর প্রকরণে আমরা বলে এসেছি যে কিষ্কিন্ধ্যা নামক নগর ভূমি মধ্যে অবস্থিত ছিলো,

সেখানে সুন্দর গৃহ ও বাজার ছিলো। পুষ্পোদ্যান ও বৃক্ষ স্থানে স্থানে শোভিত হচ্ছিল। লন্ডনের মতো ভূতল নগর নির্মাণ-কলা কেবল আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্বানদের নয় কিন্তু প্রাচীন সময়েও ভূতল নগর নির্মাণকলা রামায়ণকালেও ছিলো। ভারতীয় গুহা নগরী হায়দ্রাবাদ দক্ষিণে ঔরঙ্গাবাদ জেলায় এলোরা এজন্টা নামে বিখ্যাত যা তিন মাইল পর্যন্ত পর্বত খুঁড়ে বিশাল প্রাসাদ ত্রিতল পর্যন্ত নির্মিত।

উদ্যানকলা —

কাননৈঃ কৃত্রিমৈশ্চাপি সর্বতঃ সমলঙ্কৃতা।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ১৪/৩৫)

কৃত্রিম জঙ্গলে অর্থাৎ উদ্যান ও বাগানে সুশোভিত লঙ্কাপুরী বিশ্বকর্মা নির্মাণ করেছিলেন।

ভূতল-উদ্যান —

ভূতল নগর প্রসঙ্গে ভূতল পুষ্প বাটিকা এবং কখনও বৃক্ষের উল্লেখ এসেছে। এখন ভূতল মহান উদ্যানও লক্ষ্য করুন –

ইত্যুক্ত্বা তদ্বিলং সর্বে বিবিশুস্তিমিরাবৃতম্॥
অচন্দ্রসূর্যং হরয়ো দদৃশু রোমহর্ষনম্
ততস্তং দেশমাগম্য সৌম্যা বিতিমিরং বনম্॥
দদৃশুঃ কাঞ্চনান বৃক্ষাম্ দীপ্তবৈশ্বানরপ্রভান্।
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৫০/১৭,১৮,২৪,২৫)

হনুমানসহ সুগ্রীবাদি সীতার অন্বেষণে একটা ভূমিদ্বারে প্রবিষ্ট হলো যেখানে প্রথমে ঘন অন্ধকার এবং পরে আলোকময় বনস্থল দেখা গেলো যার মধ্যে সোনালী ও উজ্জ্বল বৃক্ষ ছিলো।

প্রাচীন ভূতল শিল্পের এটাও একটা উদাহরণ যে, সে সময় ভূতল উদ্যানেরও অস্তিত্ব ছিলো।

৩. আয়ুধ (অস্ত্র-শস্ত্র)

রামায়ণে আয়ুধ (শাস্ত্র) সম্পর্কেও যথেষ্ট উচ্চ শ্রেণির বর্ণনা পাওয়া যায়।

শতঘ্নী (তোপ-কামান) ইত্যাদি —

সর্বযন্ত্রায়ুধবতীং.... । ১০
শতঘ্নীশতসংকুলাম্ অযোধ্যাম্। ১১
(বা০ রা০বাল্য০ ৫/১০-১১)

অযোধ্যা নগর সর্বপ্রকার যন্ত্রায়ুধ অর্থাৎ যন্ত্র ও আয়ুধে সজ্জিত ছিলো এবং শত শত তোপ ছিলো।

অস্ত্র —

লক্ষ্মণস্য চ নরোচা বহরঃ সন্তি তদ্বিধাঃ।
বজ্রাগ্নিসমস্পর্শা গিরীনামপি দারকাঃ॥
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৫৪/১৫)

লক্ষ্মণের নিকট নারাচ নামক অস্ত্র বহু আছে। এই অস্ত্র বজ্র ও বিদ্যুৎ সম আঘাত হানে এবং পর্বত বিদীর্ণ করে দেয়।

রৌদ্রেন কচ্চিদস্ত্রেন রামেন নিহিতং রনে।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৩৬/২৭)

এখানে রামের রৌদ্র অস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

অথ দাশরথী রামো রৌদ্রমস্ত্রং প্রয়োজয়ম্।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৬৭/১১৬)

এখানেও রামের রৌদ্র অস্ত্রের বর্ণনা আছে।

ব্রাহ্মেণাস্ত্রেণ ॥

(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৭১/১০৩)

এখানে ব্রহ্মা অস্ত্রের কথা বলা হয়েছে।

ব্রাহ্মমস্ত্রং চ রৌদ্রং চ বায়ব্যং বারুণং তথা ॥

(বা০ রা০ সুন্দর০ ৫৯/১০)

এখানে ব্রহ্মা, রৌদ্র, বায়ব্য, বরুণ অস্ত্রের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।

অস্ত্র নিক্ষেপ্য প্রয়োগের নাম, যেমন, বায়ব্য অস্ত্র – বায়ু অর্থাৎ বিষবায়ু নিক্ষেপকারী বারুণ বা বরুণ জলীয় কুয়াশাচ্ছন্ন, ধূম্র নিক্ষেপকারী, রৌদ্র অগ্নি নিক্ষেপ করে, ব্রহ্মা অস্ত্র বিশেষ প্রকারের অস্ত্র।

রাম যুদ্ধে সর্পাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হতে দেখে তার প্রতিকার হেতু গারুৎমত অস্ত্র ত্যাগ করলেন।

আটটি বোমাযুক্ত অস্ত্র —

তদ্রাবনকরান্মুক্তং বিদ্যুন্মালাসমাহতম্।
অষ্টঘণ্টং মহানাদং বিয়দগতমশোভত ॥

(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১০২/৬১)

রাবণের হস্ত হতে নিক্ষিপ্ত, বিদ্যুৎ তরঙ্গ সন্নিবেশিত, আটটি উজ্জ্বল বোমা যুক্ত মহা নাদকারী অস্ত্র আকাশে প্রতিভাত হলো।

বানের প্রত্যাবর্তন —

সায়কস্তু মুহূর্তেন তালান্ ভিত্বা মহাজবঃ।
নিষপত্য চ পুনস্তূনং তমের প্রবিবেশ হ ॥

(বা০ রা০ কিষ্কি০ ১২/৪)

মহাবেগবান বাণ তালবৃক্ষগুলি ভেদ করে পুনরায় তৃণে প্রবিষ্ট হলো।

তং সমুৎসৃজ্য সা শক্তিঃ সৌমিত্রিং যুধি নির্জিতম্।
রাবণস্য রথে তস্মিন্ স্থানং পুনরুপাগমৎ॥

(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৫৯/১২০)

রাবণের নিক্ষিপ্ত শক্তি নামক অস্ত্র লক্ষ্মণের উপর প্রহার করে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করে।

অন্যান্য আয়ুধ —

তত্রেষুপলযন্ত্রাণি বলবন্তি মহান্তি চ।....
শতঘ্নো রক্ষসাং গনৈঃ.. যন্ত্রৈ রুপেতা.. যন্ত্রৈ স্তৈরবকীর্যন্তে পরিখাসু সমন্ততঃ॥

(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৩/১২, ১৩, ১৬, ১৭)

এখানে ইষু, উপল (বোমগোলা) নিক্ষেপকারী যন্ত্র ও কামানের বর্ণনা দেওয়া আছে।

৪. হস্তশিল্প

রামায়নকালে বিবিধ হস্তশিল্পও উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যার উল্লেখ এখানে করা হলো :

দাঁত তৈরি করা —

দন্তকারাঃ সুধাকারা যে চ গন্ধোপজীবিনঃ।

(বা০ রা০ অযো০ ৮৩/১৩)

এখানে অযোধ্যানগরের শিল্পীদের গণনায় দন্তকারাঃ অর্থাৎ দন্তনির্মাণকারীও এসেছে।

অঙ্গরাগ অনুলেপন —

অঙ্গরাগং চ বৈদেহি মহার্হমনুলেপনম্॥
ময়া দত্তমিদং সীতে তব গাত্রানি শৌবয়েৎ।

(বা০ রা০ অযো০ ১১৮/১৮-১৯)

অত্রি ঋষির পত্নী অনুসূয়া সীতাকে অঙ্গরাগ অনুলেপন (অঙ্গকে সুন্দর বর্ণযুক্ত করার সেইরকম

লেপন বা পালিশ) প্রদান করে বললেন – হে সীতা ! মম প্রদত্ত অঙ্গরাগ অনুলেপন মূল্যবান। গ্রহণ করো এটি তোমার অঙ্গ শোভাযুক্ত, উজ্জ্বল বর্ণযুক্ত করে দিবে।

বহুশলাকাযুক্ত ছত্র (ছাতা) —

ইদং বহুশ্লাকং তে পূর্ণচন্দ্রমিবোদিতম্।
ছত্রং সবালব্যজনং প্রতীচ্ছস্ব ময়া ঘৃতম্॥
(বা০ রা০ কি০ ১০/৩)

এই বহু শলাকাযুক্ত ছত্র পূর্ণচন্দ্রসম, হে সীতা ! তুমি এটি গ্রহণ করো।

সূক্ষ্ম শলাকাযুক্ত ছত্র —

যত্রৈতদিন্দুপ্রতিমং বিভাতিচ্ছত্রং সিতং সূক্ষ্মশ্লাক মগ্র্যম্।
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৫৯/২৪)

যেখানে এই চন্দ্রসম সূক্ষ্মশলাকাযুক্ত অভাময় শুভ্র উত্তম ছত্র উজ্জ্বল রূপ ধারণ করে।

স্ফটিক, মনি ও স্বর্ণপাত্র —

সোনালী ও স্ফটিক নির্মিত বিবিধ প্রকারের পাত্র দ্বারা সুশোভিত স্থল ছিলো।

গৃহং মনিভাজন সংকুলম্।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৬/৪২)

হনুমান রাবণের গৃহ মনিময় পাত্র দ্বারা সজ্জিত দেখতে পেলেন।

স্ফটিকের গবাক্ষ —

অমী ময়ূরাঃ শোভন্তে প্রনৃত্যন্তস্ততস্ততঃ।
স্বৈঃ পক্ষৈঃ পবনোদ্ধূতৈগবাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈরিব॥
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ১/৩৬)

এখানে নৃত্যরত ময়ূরের পক্ষ (পাখা) বায়ুভরে যখন উত্থিত হয় তখন তার সঙ্গে স্ফটিকের গবাক্ষের উপমা দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ সেই সময় স্ফটিকের গবাক্ষ থাকা প্রমাণ হয়।

লঙ্কায় বিদ্যুতের বৃহৎ পাত্র ও ল্যাম্প —

তাং নষ্টতিমিরাং দীপৈর্ভাস্বরৈশ্চ মহাগ্রহৈঃ।
নগরীং রাক্ষসেন্দ্রস্য দদর্শ স মহাকপিঃ॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৩/১৯)

হনুমান সেই লঙ্কাকে অন্ধকাররহিত দেখলেন। সেখানে মহাগ্রহ অর্থাৎ বৃহৎ পাত্র, ভাস্বর, অতি তীব্র আলো নিক্ষেপকারী গৃহ অর্থাৎ বিদ্যুৎগৃহ ছিলো।

সোনা-রূপার পালিশ —

কাঞ্চণানি বিমানানি রাজতানি গৃহানি চ।
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৫১/৫)

হনুমান বললেন যে – লঙ্কায় সোনালী (স্বর্ণবর্ণ সোনার পালিশ যুক্ত) বিমান ও রৌপ্য বর্ণযুক্ত (রূপার পালিশ করা) গৃহ ছিলো।

মহী কৃতা পর্বতরাজিপূর্ণা শৈলাঃ।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৭/৯)

পুষ্পক বিমানে আরোহীর দাঁড়িয়ে থাকার স্থান সোনা এবং মুক্তা দিয়ে তৈরি।

সীলমোহর বা নামমুদ্রা —

রামনামাঙ্কিতং চেদং পশ্য দেব্যঙ্গুলীয়কম্।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৩৬/২)

হনুমান সীতাকে বললেন – হে সীতা ! অতিজ্ঞানের জন্য রাম নামাঙ্কিত আংটি দর্শন করুন।

আংটিতে রাম-নাম খোদিত ছিলো। রামের স্বাক্ষর অঙ্গুরীয়তে খোতিত করাও একটি শিল্প।

কৃত্রিম মৃগ —

সৌবর্ণস্তং মৃগো ভূত্বা চিত্রো রজতবিন্দুভিঃ ॥
আশ্রমে তস্য রামস্য সীতায়াঃ প্রমুখে চর।
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৪০/১৭,১৮)

রাবণ মারীচকে বললেন – তুমি চিত্রবিন্দুময় স্বর্ণমৃগ হয়ে রামের আশ্রমে সীতার সম্মুখে বিচরণ করো।

দীপ্তজিহ্বো মহাকায়স্তীক্ষ্মদংষ্ট্রো মহাবলঃ।
ব্যচরং দন্ডকারণ্যং মাংসভক্ষো মহামৃগঃ ॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৩৯/৩)

মারীচ কেমন মৃগরূপ ধারণ করেছিল তা রাবণকে বলে যে, দীপ্তজিহ্বাসম্পন্ন মহাকায় তীক্ষ্ম দন্ত যুক্ত মহাবলী মাংসভক্ষক মহামৃগের রূপ ধারণ করে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করছিল।

রামের কৃত্রিম শির —

মোহয়িষ্যাবহে সীতাং মায়য়া জনকাত্মজাম্ ॥
শিরো মায়াময়ং গৃহ্য রাঘবস্য নিশাচর।।
মাং ত্বমুপতিষ্ঠস্ব মহচ্চ সশরং ধনুঃ ॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৩১/৭,৮)

রাবণ মধুজিহ্ব রাক্ষসকে আদেশ করলেন তুমি রামের মায়াময় অর্থাৎ কৃত্তিম শির তৈরি করে নিয়ে এসো। শরসহ ধনুক তার সঙ্গে থাকবে। এই ভাবে সীতাকে প্রতারিত করবো।

কৃত্রিম সীতা —

ইন্দ্রজিতু রথে স্থাপ্য সীতাং মায়াময়ীং তদা।
বলেন মহতাবৃত্য তস্যা বধমরোচয়ৎ ॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৮১/৫)

ইন্দ্রজিৎ মায়াময়ী কৃত্রিম সীতাকে রথে বসিয়ে যুদ্ধস্থলে রামের সম্মুখে অত্যন্ত বলপূর্বক তাকে বধ করতে থাকে।

এইরূপ রামায়ণকালে কোন ব্যক্তির হুবহু মুখ এমনকি শরীর, আকৃতি রং ও কণ্ঠস্বর রচনা করার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিলো।

৫. যন্ত্র ও যন্ত্রযান

রামায়ণে যন্ত্র ও যনযানেরও বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। যন্ত্রের উল্লেখ কয়েকটি স্থলে এসেছে। যেমন "**সর্বাযন্ত্রায়ুধ বতীং....**" (বা০ রা০ বাল্য০ ৫/১০) কিন্তু এখানে সেই সব যন্ত্রের উল্লেখ করা হবে যেগুলি স্থান-কাল বিশেষে অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

বিশাল শিলা উত্তোলন করার যন্ত্র —

হস্তিমাত্রান্ মহাকায়াঃ পাষানংশ্চ মহাবলাঃ।
পর্বতাংশ্চ সমুৎ পাটয় যঃন্ত্রৈঃ পরিবহন্তি চ॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ২২/৬০)

হস্তীসদৃশ বৃহৎ শিলা ও পর্বতকে উৎপাটন করে যন্ত্র দ্বারা সেগুলি পরিবহনও করা হতো।

যেমন আজকাল যন্ত্র দ্বারা ভারী বস্তু উত্তোলন করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় সেইরূপ কার্য এখানেও যন্ত্র দ্বারা করার কথা বলা হয়েছে। ভূতলনগর থেকে অবিলম্বে বাইরে আনার বিদ্যুৎ সোপান সদৃশ যন্ত্র সীতার অন্বেষণে হনুমান সহিত বানর সৈনিকরা কোনো ভূতল নগরে তার কোনো দ্বার দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। ভিতরে ভ্রমণ করে তারা রাস্তা ভুল করে, পরে তারা সেখানকার স্বয়ম্প্রভা নাম্নী এক রক্ষিকার নিকট বাইরে বের হওয়ার জন্য অনুরোধ করে, সে তাদেরকে নিমেষে বিদ্যুৎ সোপানের মতো যন্ত্রের মাধ্যমে বাইরে বের করে দেয়। বর্ণনা নিম্ন প্রকার।

নিমীলিয়ত চক্ষুংষি সর্বে বানর পুঙ্গরাঃ ॥
নহি নিষ্ক্র মিতুং শক্যমনি মীলিত লোচনৈঃ।
ততো নিমীলিতাঃ সর্বে সুকুমারাঙ্গ লৈঃ করৈঃ ॥
সহসা পিদধুর্দৃষ্টিং হৃষ্টা গমনকাংক্ষয়া।
বানরাস্ত মহাত্মানো হস্তরুদ্ধমুখাস্তদা ॥
নিমেষান্তরমাত্রেন বিলাদুত্তারিতাস্তয়া ॥
(বা০ রা০ কি০ ৫২/২৭-৩০)

হনুমান ইত্যাদিকে সেই রক্ষিকা দ্বারপালিকা স্বয়ংপ্রভা বলে – তোমরা সকলে চক্ষু বন্ধ করো। চক্ষু বন্ধ না করে কেউ এখানে থেকে বাইরে বের হতে পারে না। (ভেদ যাতে জানতে না পারে এইজন্য চক্ষু বন্ধ করানো হলো)।

তারপর সেই সব বানরসৈনিকরা নিজ নিজ হস্ত দ্বারা চক্ষু বন্ধ করে। সেই দ্বারপালিকা তাদেরকে সেই ভূতল নগরের সুড়ঙ্গ দিয়ে বাইরে বের করে দিলো।

যেমন আধুনিক কালে বিদ্যুৎ সোপান বা বিদ্যুতের খাঁচা (লিফট) হয়। তার মধ্যে বসলে শীঘ্রই উপর থেকে নিম্নে বা নিম্ন থেকে উপরে ওঠা যায় সেই প্রকার যন্ত্রের খাঁচা সদৃশ পীঠাসন বা স্থণ্ডিল যন্ত্রের এখানে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

যান-যন্ত্রযান —

রাবণের নিকট আকাশে ওড়ার জন্য বিমান ছিলো কিন্তু তার কাছে এমন যন্ত্রযানও ছিলো যা ভূমিতে তীব্র গতিতে চলতে পারে —

সহস্রখরসংযুক্তো রথো মেঘসমস্বনঃ।
(বা০রা০যুদ্ধ০ ৬৯/৪)

এখানে বলা হয়েছে যে রাবণের কাছে সহস্র খরযুক্ত মেষসমান গর্জনকারী যান ছিলো।

এখানে সহস্রখর যুক্ত রথের কথা বলা হয়েছে। খরের অর্থ লৌকিক ভাষায় গাধা সুতরাং হাজারটি গাধা যোগ করার অর্থ করা হয়। কিন্তু হাজারটি গাধা যুক্ত করা অসম্ভব ব্যাপার। আর

যদি গতির প্রশ্ন থাকে তাহলে ঘোড়া কেন যোগ করা হবে না ? গাধার চেয়ে ঘোড়া অবশ্যই বেশি বেগবান, এখানে বাস্তবিক তথ্য অন্য খর কোনো প্রাণীবিশেষ না হয়ে আধিদৈবিক বস্তু। বলাও হয়েছে "**অশ্বিনোঃ খরাঃ**" (নিঘ০ ১/ ১৫) অর্থাৎ অশ্বিনৌর উপযোজন খর। অশ্বিনৌর জন্য বলা হয়েছে যে, "**জ্যোতিষ্যন্যঃ, রসৌনান্যঃ**" (নিরুক্ত)। একটা জ্যোতির্ময় অন্যটি রসময়। একে অগ্নি ও জল বলতে পারেন, বিদ্যুৎ ও বায়ু অথবা বায়ব্য সম্পাদক বস্তু তৈল ও (যেমন পেট্রোল) বলতে পারেন কিংবা বিদ্যুতের ধন-ঋণ প্রভেদও বলতে পারেন কেননা স্বয়ং রামায়ণেও উক্ত দুই প্রকারের বিদ্যুতের উল্লেখ এসেছে, সেখানে একটাকে শুষ্ক ও অন্যটিকে আর্দ্র বলা হয়েছে। **অশনী দ্বে প্রয়চ্ছামি শুষ্কাদ্রে রঘুনন্দন** (বা০ রা০ বাল্য ২৭/৯) বিশ্বামিত্র দ্বারা অস্ত্র প্রদান প্রকরণে বলা হয়েছে – হে রাম ! আমি তোমাকে শুষ্ক ও আর্দ্র দুই প্রকার বিদ্যুৎ দান করছি। সুতরাং এখন খরের অর্থ অগ্নি ও জল সম্মিলিত শক্তি অথবা বিদ্যুৎ ও বায়ব্য সম্পাদক তৈলের (পেট্রোলের মতো) সম্মিলিত বেগ বা শুধু বিদ্যুৎ ধারা বলতে পারেন, এই শক্তি সমূহ দ্বারা চালিত রাবণের রথ, যন্ত্রযান ছিলো।

৬. *বিমান (বায়ুযান)*

রামায়ণের মধ্যে বিমান সম্বন্ধে কয়েক স্থলে বর্ণনা পাওয়া যায় যার তার কিছু নিদর্শন এখানে তুলে ধরা হলো।

মনুষ্য বাহক পুষ্পক বিমান —

কৈলাসপর্বতং গত্বা বিজিত্য নরবাহনম্।
বিমানং পুষ্পকং তস্য কামগং বৈ জহার যঃ ॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৩২/১৪)

কৈলাস পর্বতে গিয়ে সেখানে মনুষ্য বাহনের জন্য পুষ্পক নামক বিমান আনীত হলো।

যস্য তৎ পুষ্পকং নাম বিমানং কামগং সুভম্।
বীর্যাদাবর্জিত ভদ্রে যেন যামি বিহায়সম্॥
(বা০ রা০ অরণ্য০ ৪৮/৬)

রাবণ সীতাকে বললেন – হে সীতা ! সুন্দর পুষ্পক বিমানের স্বামী পূর্বে বিশ্রবণ (কুবের) ছিলেন। আমি বলপূর্বক এটা তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি। এর দ্বারা আমি আকাশে যাতায়াত করি।

স তস্য মধ্যে ভবনস্য মংস্থিতো মহদ্বিমানং মনিরত্নচিত্রিতম্।
প্রতপ্তজাম্বুনদ জালকৃত্রিমং দদর্শ ধীমান পরনাত্মজঃ কপিঃ॥
তদ প্রমেয় প্রতীকার কৃত্রিমং কৃতং স্বয়ং স্বধ্বিতি বিশ্বকর্ম না।
দিবং গতে বায়ু পথে প্রতিষ্ঠিতং ব্যরজেতাদিত্যপথস্য লক্ষ্মবৎ॥
স পুষ্পকং তত্র বিমান মুত্তমং দদর্শ তদ্বানরবীর সত্তমঃ॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৮/১,২,৮)

হনুমান দেখলেন লঙ্কায় রাবণের নিবাস স্থানে মনিরত্ন জড়িত স্বর্ণতারের জালিকা যেখানে লাগানো ছিলো তার তুলনা হতে পারে না। আকাশে গমনরত বায়ুমার্গে সূর্যপথের চিহ্ন সদৃশ দৃশ্যমান পুষ্পক বিমানকে তিনি দেখলেন।

জালবাতায়নৈর্যুক্তং কাঞ্চনৈঃ স্ফটিকৈরপি।
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৯/১৬)

সেই পুষ্পক বিমান স্বর্ণজালি ও স্ফটিক মনির গবাক্ষযুক্ত ছিলো।

পুষ্পক বিমানের গতি —

অহ্না ত্বাং প্রাপয়িষ্যামি তাং পুরীং পার্থিবাত্মজ।
পুষ্পকং নাম ভদ্রং তে বিমানং সূর্যসন্নিভম্॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ১২১/৮,৯)

বিভীষণ রামকেব বললেন – হে রাম! আমি তোমাকে একদিনে-দিনের মধ্যে আট-দশ ঘন্টায়

পুষ্পক বিমানে করে অযোধ্যায় পৌঁছে দিবো। উক্ত কথনে পুষ্পক বিমানের গতি ঘন্টায় আড়াই শ মাইলের মতো ছিলো। স্মরণ থাকে যে, পুষ্পক বিমান একটা বড়ো বিমান যার মধ্যে কয়েক শত লোক বসে থাকতে পারে।

কেননা শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা, বিভীষণ, সুগ্রীব এবং অনেক সৈনিকও তার মধ্যে বসে অযোধ্যা এসেছিলেন। এইরকম বৃহৎ বিমানের গতি আড়াই শত মাইল ছিলো। সেই তুলনায় যদি ছোট বিমান হতো তাহলে তার ওড়ার গতি ঘন্টায় এর কয়েক গুণ হতে পারতো।

জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ছোটো বিমানের সংখ্যা লঙ্কায় অনেক ছিলো। বিভীষণও রামের কাছ বিমানে করে উড়ে এসেছিলেন। কিন্তু পুষ্পক বিমান অত্যন্ত বিশাল ছিলো যার মধ্যে কিছু সেনাও বসে থাকতে পারে যেমন আধুনিক কালে বিমানে সেনা বসে যাতায়াত করে। পুষ্পকবিমানে কোন একটা হংসযন্ত্র বা হংসাকারসদৃশ অগ্রভাগ সংযুক্ত ছিলো এবং মধ্যে রেলের মতো কামরা বা বসার স্থান থাকবে হয়তো। রামায়ণের বিমানশিল্প অত্যন্ত উচ্চ স্তরের ছিলো।

৭. *বিজ্ঞান*

রামায়ণ-যুগে বিজ্ঞানের উল্লেখ পাওয়া যায় যে সেই সময় বিজ্ঞান অনেক উন্নত অবস্থায় ছিলো। এর দু-একটা উদাহরণ এখানে দেওয়া যেতে পারে।

বিদ্যুতের দুটি ধারা – ধনাত্মক ও ঋণাত্মক —

অশনি দ্বে প্রয়চ্ছামি শুষ্কার্দ্রে রঘু নন্দন।

(বা০ রা০ বাল্য০ ২৭/৯)

রামকে অস্ত্র প্রদান কালে বিশ্বামিত্র ঋষি রামকে বললেন “হে রাম ! শুষ্ক ও আর্দ্র এই দুটি বিদ্যুৎ আমি তোমাকে প্রদান করছি।” এই শুষ্ক আর্দ্রবিদ্যুৎ ধন ও ঋণ হতে পারে। পাশ্চাত্য

বিজ্ঞানের পরিভাষায় পজেটিভ ও নেগেটিভ বুঝতে হবে। এদের শুষ্ক ও আর্দ্র প্রাচীন পারিভাষিক শব্দ।

বিদ্যুৎ-বাতি —

তাং নষ্টতিমিরাং দীপ্তৈর্ভাস্বরৈশ্চমহাগৃহৈঃ।
নগরীং রাক্ষসেন্দ্রস্য দদর্শ মহাকপিঃ॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৩/১৯)

হনুমান সেই লঙ্কাকে অন্ধকাররহিত দেখলেন যেখানে উজ্জ্বল আলো নিক্ষেপকারী গৃহ (বিদ্যুৎগৃহ) ছিলো।

৮. অন্যান্য বিদ্যা

রামায়ণে অন্যান্য বিদ্যারও অনেক উদাহরণ লক্ষিত হয় যার মধ্যে কয়েকটি এখানে প্রদত্ত হলোঃ

শবকে যথাবৎ রাখার বিদ্যা —

বালস্য চ শরীরং তত্তৈলদ্রোন্যাং নিধাপর।
গন্ধৈশ্চ পরমোদা রৈস্তৈলৈশ্চ সুসুগন্ধিতঃ॥
যথা ন ক্ষীয়তে বালস্তথা সৌম্য বিধীয়তাম্।
বিপত্তিঃ পরিভেদো বা ন ভবেচ্চ ততা কুরু॥
(বা০ রা০ উ০ ৭৫/২-৪)

রামের রাজ্যে জনৈক ব্রাহ্মণবালকের জীবনাবসান হয়। সেই মৃত বালককে যথাবৎ রাখার জন্য রাম আদেশ দিলেন – বালকের শরীর তৈলের দ্রোনীমধ্যে রেখে দাও। তন্মধ্যে গন্ধচূর্ণ ও সুসুগন্ধযুক্ত পরমোদার তৈলও দাও। এর ফলে বালকের দেহ ক্ষীণ হবে না, বর্ণ ও আকার নষ্ট হবে না এবং কোথাও মাংস দীর্ণ হবে না, সন্ধিও ছিন্ন হবে না।

জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় তথ্যও রামায়ণে লক্ষিত হয়।

সূর্যে কৃষ্ণ দাগ বা কালিমা —

আদিত্যে বিমলে নীলং লক্ষ্ম লক্ষ্মণ দৃশ্যতে।

(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ২৩/৯)

রাম বললেন – হে লক্ষ্মণ ! বিমল সূর্যে নীল দাগ দেখা যায়।

এইভাবে সূর্যে কালো দাগ বা ছাপ রাম দেখলেন।

দূরবীক্ষণের মতো যন্ত্র —

যত্নেন মহতা ভূয়ো ভাস্করঃ প্রতিলোকিতঃ।
তুল্য পৃথিবীপ্রমানেন ভাস্করঃ প্রতিবাতি নৌ॥

(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৬১/১৩)

সম্পাতি রামকে বললেন – বৃহৎ যন্ত্র দিয়ে আমরা সূর্যকে দেখলাম যা পৃথিবীর মতো বৃহৎ। এখানে পৃথিবীর মতো বৃহৎ বলা অত্যুক্তি হতে পারে কিন্তু তার বৃহদাকার প্রতিভাত হলো বলায় কোনো ক্ষতি নেই।

হনুমান ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা

প্রশ্ন – হনুমানাদি সুগ্রীব পক্ষীয় ব্যক্তিদেরকে বানর বলা হয়ে থাকে। এরা কি সত্যিই বানর ছিলো না মনুষ্য ? যদি মনুষ্য হয় তবে তাদের লেজ কেন ?

আলোচনা – হনুমানাদিকে বানর বলা হয় সত্য কিন্তু প্রাকৃতিক বানরের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আছে, কারণ নর মনুষ্যকে বলে। বা-নর বিকল্পনর অর্থাৎ নরের মতো খ্যাত হয়েও নগরে নিবাস না করে গিরি-পর্বতের গুহায়, ভূতলগহে নিবাসকারী বলে তাদেরকে বানর বলা যেতে পারে, যেমন গেরিলা সেনা বা সৈনিক এখনও বর্তমান, বানর তাদের কর্মনাম হতে পারে। তবে, লেজের বর্ণনা বাল্মীকি রামায়ণেও এসেছে, এজন্য যদি তাদেরকে বানর বলা হয় তবে অত্যন্ত চিন্তাজনক ব্যাপার কেননা তাদের সম্বন্ধে এমন বর্ণনা পাওয়া যায় যা বানরের পক্ষে প্রতিকূল এবং তাদেরকে মনুষ্য প্রতিপন্ন করে। যেমন রামের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা বলা, তাদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন হওয়া রাজ্যভারে গুরু দায়িত্ব নির্বাহ করা, বেদ-ব্যাকরণ জ্ঞাত হওয়া, অস্ত্র বিদ্যায় নৈপুন্য, প্রাকৃত বানর থেকে ভিন্ন কথিত হওয়া ইত্যাদি। এইরকম কিছু স্থল অবশ্যই দ্রষ্টব্য যেমন :

সুগ্রীবকে রাজা বলা এবং শাসন ভার পালন করা —

নহ্যবুদ্ধিং গতো রাজা সর্বভূতানি শাস্তি হি।

(বা০ রা০ কিষ্কি০ ২/১৮)

যে সময় রাম-লক্ষণ সুগ্রীবের নিবাস অর্থাৎ বনে বিচরণ করছিলেন সেই সময় সুগ্রীব অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, এঁরা সম্ভবত বালির পক্ষ হয়ে তাঁদের খোঁজ করছে। তখন হনুমান তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন – "ভয় করো না। বুদ্ধিপূর্বক কর্ম করো। অবুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে রাজা সব প্রজাকে শাসন করতে সক্ষম হয় না।"

সুগ্রীব নিজেকে মনুষ্য বলছেন —

বালিপ্রনিহিতাবের শঙ্ক্যেহং পুরুষোত্তমৌ।
রাজানো বহুমিত্রাশ্চে বিশ্বাসো নাত্র হি ক্ষমঃ॥
অরয়শ্চ মনুষ্যেন বিজ্ঞেয়াশ্চমচারিনঃ।
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ২/২১,২২)

পুনরায় সুগ্রীব হনুমানকে বললেন যে – এই দুই উত্তম ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই বালি প্রেরণ করেছেন কেননা রাজাদের অনেক মিত্র থাকে। এখানে বিশ্বাস করা উচিত নয়, শত্রুরা ছলের সাহায্যে কাজ করে এটা মনুষ্যের জানা কর্তব্য।

এই বচনে সুগ্রীব নিজেকে মনুষ্য বলেছেন।

হনুমানের বেদ-ব্যাকরণ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা —

নানৃগ্বেদ বিনীতস্য নাযজুর্বেদধারিনঃ।
না সাম বেদ বিদুষঃ শক্যমেবং প্রভাষিতুম॥
নূনং ব্যকরনং কৃৎস্নমনেন বহুধা শ্রুতম্।
(বা০ রা০ কি০ ৩/২৮-২৯)

রাম হনুমানের সম্বন্ধে বললেন – ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদের বিদ্বান না হলে এরকম ভাষণ করতে পারেন না। নিশ্চয়ই তিনি ব্যাকরণও যথেষ্ট পাঠ করেছেন।

বানর বেদ-ব্যাকরণ পাঠ করতে পারে না। একমাত্র মনুষ্যের পক্ষেই সেটা সম্ভব।

অস্ত্র বিদ্যায় নৈপুন্য —

কৃতাস্ত্রৈঃ প্লবগৈঃ শক্তৈর্ভবদ্ভিবিজয়ৈষিভিঃ।
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৬০/৭)

এখানে বানরদেরকে অস্ত্র বিদ্যাকুশল বলা হয়েছে। একমাত্র মনুষ্যই সেই বিদ্যা উপার্জন করতে পারে।

হনুমান স্বাভাবিক বানর ছিলেন না —

স বৃক্ষখন্ডান তরসা জহার শৈলাৎ শিলাঃ প্রাকৃতবানরাঁস্তথা ॥
(বা০ রা০ যুদ্ধ০ ৭৪/৫০)

হনুমান যখন সঞ্জীবনী ওষুধ নিতে যান তখন তিনি বৃক্ষের শাখা, পর্বত ভাগ, শিলা ও প্রাকৃত বানরদেরকে (অর্থাৎ স্বাভাবিক বানর = জন্মজাত বানর) ছিন্ন-ভিন্ন করে দিলেন।

উক্ত কথন থেকে স্পষ্ট হনুমান প্রাকৃত বানর (জন্মজাত বানর) ছিলেন না। এখন রইলো লেজ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, সেটা সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

হনুমানাদির লেজ সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য রামায়ণের বচন এখানে উদ্ধৃত করা হলো যেখানে হনুমানকে বানরবেশ ত্যাগ করে মনুষ্যরূপে হওয়া দর্শানো হয়েছে —

কপিরূপং পরিত্যজ্য হনুমান মারুতাঅজঃ।
ভিক্ষুরূপং ততো ভেজে শঠবুদ্ধিতয়া কপিঃ ॥
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৩/২)

হনুমান রাম-লক্ষ্মণের নিকট যাওয়ার জন্য বানর রূপ পরিত্যাগ করে ভিক্ষুকরূপ সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করলেন।

শ্রুত্বা হনুমতো বাক্যং সুগ্রীবো বানরাধিপঃ।
দর্শনীয়তমো ভূত্বা প্রতীত্যোবাচ রাঘবম্ ॥
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৫/৯)

হনুমানের কথা শুনে বানরাজ সুগ্রীব অত্যন্ত দর্শনীয় রূপ ধারণ করে বললেন – ....

হনুমান ও সুগ্রীবের এইভাবে বানর রূপ পরিত্যাগ করে মনুষ্যরূপে আসা প্রমান করে যে, তাদের বানররূপ কৃত্রিম, জন্মজাত ছিলো না। কৃত্রিম বানর রূপ ধারণ করলে লেজ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বানর বেশ ধারণ করার প্রয়োজনীয়তাই বা কী ? এর অনেক কারণ হতে পারে। বাল্মীকি রামায়ণে এ সম্পর্কে কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। রাজনৈতিক কারণে অথবা

রাক্ষস-ভয়ে তাদেরকে বানরবেশ ধারণ করতে হয়েছিল বা এই রকম সৈনিক বেশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। আজকাল বিষাক্ত গ্যাস ত্যাগকারী সৈনিকদের বেশ হাতির মতো হয়, মুখের সামনে নাকের সঙ্গে লম্বা শুঁড় (মাস্ক) শ্বাস গ্রহণের জন্য লাগানো থাকে। এই সেনাকে হাতি পল্টন বলা যেতে পারে যেমন ঘাঘরা পরিধানকারী পল্টনকে ঘাঘরা পল্টন এবং চোটি (শিখা) পল্টন বলে। এক সেনাদল আছে যাদের মাথার পিছনে চোটি (শিখা = টিকি) লাগানো থাকে। হনুমানাদির লেজ কোনো অস্ত্র বিশেষের সাধনও হতে পারে যেমন আজকাল সৈনিক বন্দুক পিছনে ঝুলিয়ে থাকে। যদি সেই বন্দুক উপরের দিকে হয় তবে তা লেজের মতো মনে হবে। সম্ভবত এইরকম কিছু ধারণ করার জন্য তারা বানর নামে অবিহিত হয়েছিল। লেজে স্প্রিং ও বিদুৎতের সংযোগ থাকলে তারা যথেষ্ট লম্ফ-ঝম্প করতে পারে এবং শত্রুর উপর প্রহার করতে পারে। হনুমানকে কয়েকটি স্থলে বিদ্যুতের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে, যেমন —

নিমেষান্তরেন নিরালেম্বনমম্বরম।
সহসা নিপতিষ্যামি ঘনাদ্ বিদ্যুদিবোত্থিতা॥
(বা০ রা০ কিষ্কি০ ৬৭/২৪)

হনুমান বললেন এক নিমেষে নিরালম্ব আকাশে সহসা গতিবান হবো মেঘ থেকে বিদ্যুতের মতো।

যে যথা নিপতত্যুল্কা উত্তরান্তাদ্বিনিঃসৃতা।
দৃশ্যতে মানুবন্ধা চ তথা স কপিকুঞ্জরঃ॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ১/৬৫)

হনুমান আকাশে এমন চললেন, যেমন পুচ্ছ সহিত উল্কা গতি করে।

বিচচারাম্বরে বীরঃ পরিগৃহ্য চ মারুতিঃ।
সূদয়ামাস বজ্রেন দৈত্যানিব সহস্রদৃক॥
(বা০ রা০ সুন্দর০ ৪২/৪১)

হনুমান আকাশে উঠে বজ্র দিয়ে এমন আঘাত হানলেন যেমন ইন্দ্র দৈত্যদেরকে হানে।

এর দ্বারা হনুমানাদির লেজ অস্ত্র বিশেষের সাধনও হতে পারে এবং তার দ্বারা শূন্যে উত্থিত হওয়ার বিশেষ কৌশলও হতে পারে। অস্তু।

ইতি উত্তরার্দ্ধ

॥ ওতম ॥

॥ আর্য সমাজের দশ নিয়ম ॥

- সব সত্য বিদ্যা এবং যা পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায় সে সকলের আদিমূল পরমেশ্বর।
- ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয়, নিত্য, পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা, তাঁহারই উপাসনা করা উচিত।
- বেদ সব সত্যবিদ্যার পুস্তক, বেদের পঠন-পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সব আর্যের পরম ধর্ম।
- সত্য গ্রহণে ও অসত্য পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকিবে।
- সব কাজ ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্য বিচারপূর্বক করা উচিত।
- সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করা।
- সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক ধর্মানুসার যথাযোগ্য ব্যবহার করা উচিত।
- অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করা উচিত।
- প্রত্যেককে নিজের উন্নতিতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়, কিন্তু সকলের উন্নতিতে নিজের উন্নতি ভাবা উচিত।
- সব মনুষ্যকে সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম পালনে পরতন্ত্র এবং প্রত্যেক হিতকারী নিয়মে সবাইকে স্বতন্ত্র থাকা উচিত।

য়াবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবদ্ রামায়ণকথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥
(বাল্মিকী রামায়ণ ১.২.৩৬)

যতকাল এই ধরণীতলে পর্বত দাড়িয়ে থাকবে আর নদীর ধারা প্রবাহমান থাকবে, ততকাল শ্রী রামের রামায়ণকথা এই জগতে লোকমুখে প্রচারিত হবে।